



## সূচিপত্র

- ঢাকের কথা
- চারটি গল্প ও একটি উপন্যাস
- বর্ষা
- ফেসবুক এর বান্ধবসভায় দুর্গেশনন্দিনী



# ঢাকের কথা

লিখতে লিখতে ধন্দও তো কম হয় না। কত প্রশ্ন। কার জন্য লেখা? কেন লেখা? প্রথম প্রশ্নের না হয় উত্তর হয়, বুদ্ধিমানের জন্য লেখা। কেন লেখার জবাবি শূন্যটাও কি ওখানে নিহিত নেই? নিজেকে ঠকাতেই লেখা। আমি কত বুদ্ধিমান তা প্রমাণ করতে লেখা।

হয়তো তাও নয়। কিছুটা ভান থাকলেও ভাষা এক সপ্রমাণ মাধ্যম। তাত্ত্বিকেরা তো বলেন ভাষা শুধু ভাবের গ্রাহক মাত্র নয়। ভাষার আছে নিজস্ব কিছু কোড অব কন্ডাক্ট। আছে জীবনপ্রণালী। শব্দ নৈঃশব্দ্য, শূন্য মহাশূন্য, নিরবধি সময়কে নিয়ে যে ছায়া মায়া এবং নিরেট শরীর গড়ে ওঠে, বা বলা ভাল গড়ে তোলা হয় বাস্তবতার নিপুণতায়, তার নাম কথা। কথার অন্তর্ভবনে লুকিয়ে থাকে মনিময় গ্রন্থনা। যে-সজ্জায় ভেদাভেদ থাকে না চেতন অচেতনে, সত্য আর মায়ায়, জাদু আর বাস্তবতায়। সময় কথাকে দেয় মহাশব্দের শিরোপা, বাকি সব এলেবেলে, দূর হটো। বাস্তব আর পরাবাস্তবের খটাখটি কথার বোধকে জারিত করে, মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় মহাকথায়। পরাগ্রন্থনার হঠাৎ বিরাম হঠাৎ ছুটের জাদু ভাষা যার করায়ত্ত, সে-ই সিকন্দর। পাসওয়ার্ড জানা থাকলে সন্দর্ভ রচনা, রচনার পাঠ, পুনঃপাঠ, পরাপাঠ কিছুই কিন্তু ছায়ার সঙ্গে কুস্তি নয়। জানি, কিন্তু পারি কই? তাত্ত্বিক বলেন, পাঠের নাকি আলাপ, জোড়, মীড়, গমক সবই আছে। আছে, রঙ-রূপ রেখার বিন্যাসও। কালো রঙের মেঘবালিকার মতো অক্ষর যখন আরো রূপসী হয়ে ওঠে তখন মুক্তধারা ছোটে। কালোকে আলোর মাপে সাজালেই না চোখের আরাম, মনের আনন্দ। মন না পড়লে শূন্য জগদ্বল হয়ে থাকে। পূর্ণ হয় না আর। তত্ত্ব বলে সন্দর্ভের সাজ সালঙ্কার। যা নেই কথাভুবনে, তা নেই ভারতে। মানে তত্ত্ববিশ্বে। বিশ্ব নাগরিক হওয়ার চেষ্টা করে বিব্রত হয়েছি বারবার। তবু সাধ যায়। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকার বাসনা হয়। বিনোদ সময়ে ফুলসাজের কথাবিছানা সাজিয়ে রাখি রজনীগন্ধায়। ভাষা পশরার হকারি করে বাড়ি ফেরার দিনশেষে এক অঞ্জলি জুঁইফুলে সাজিয়ে দিই মানসপ্রতিমার কবরী। যার যেমন সামর্থ্য।

মূলধন কম বলেই হয়তো ভয় যায় না। ভয় তো নয় ধন্দ। আসলে, কার কোন কাজ? লেখকের কী কর্তব্য? সে তো বুদ্ধিজীবী! বুদ্ধি দিয়ে কী করবে? অন্যজন থেকে বড় হবে? আমি শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করবে? আখের গুছোবে?

এদেশে পশ্চিমবঙ্গে এক নন্দীগ্রাম নিয়ে, এক সিঙ্গুর নিয়ে, এক লালগড়, এক মঙ্গলকোট, এক নানুর নিয়ে বড় আতান্তর এখন। বুদ্ধিজীবীকে এখন সামিল হতে হবে বিক্ষোভ, বয়কটে। এসএমএস চালান করতে হবে এই বয়ানে ‘কাল আসুন সকলে বারোটায় মেট্রো চ্যানেলে। মেধার পাশে। আওয়াজ উঠুক বরখাস্ত হোক সরকার, শুরু হোক রাজ্যপালের শাসন। ছড়িয়ে দিন বার্তা’ আসাম আন্দোলনের মিছিলে স্লোগান দিতে হত বাধ্যতামূলক ‘বিদেশি বিতাড়ন করতেই হবে’ ‘করিবই লাগিব, করিবই লাগিব’ আমরা মুখ নাড়তাম ভিন্ন জবাবে ‘বুঝলাম তো, যাইতাম কই?’ আমি নন্দীগ্রাম বুঝি না পশ্চিমবঙ্গের বিভাজিত বুদ্ধিজীবীর মতো। বলা ভাল বিক্ষুব্ধ বুদ্ধিজীবীদের মতো, যারা এতদিন সরকারি অনুগ্রহ বঞ্চিত ছিলেন, ছিলেন পাতালঘরে। নকল ভূমিকম্পের আভাস পেয়ে উঠে এসেছেন। আর শাসক দলও অপশাসনের দায় স্বীকার না করে খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আত্মহুতির দিন গুনছে। আগেকার দিনে রাজ্য জয়ের জন্য যুদ্ধ হত, মানুষ মরত। এখন রেলযাত্রী মরে, সানন্দ বিদ্বজ্জনও সঙ্গে সঙ্গে রায় দেন, এ বিপক্ষে দলের কীর্তি, ব্যাস দায়সারা। শান্তিতে বাস করার অধিকার এখন নেই অসহায় মানুষের, অসহায় মানুষের মৃত্যু দিয়ে এখন ঘোষিত হয় মানুষের জয়, মাটির জয়, মায়ের জয়। এ কেমন জয়? আমি বুঝি মানুষ মারার অধিকার কারও নাই। তাহলে কেন নন্দীগ্রাম, কেন সিঙ্গুর, কেন নানুর, কেন শাসন? দলীয় রাজনীতির উচ্চাশায় শাসকদল ভীত। ভয়েরও কত মুখ, মিডিয়ায় ভয়, বড়ো ভয় এখন প্রশাসকের, ক্যামেরাকে ভয়। নিয়মনীতি বর্জিত উচ্ছৃঙ্খলতাকে রোধ করতে হবে নিয়ম মেনে নইলে মানবাধিকারের কাছে যে চলে যাবে ফুটেজ। সাড়ে সতেরো বছরের অপশাসনের পর নাকি এবার পরিবর্তন। হাওয়ামোরগ বলছে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ সময়ের অপেক্ষা। প্রতিরোধ কমিটি গড়া হচ্ছে দিকে দিকে। স্বাধীন তাম্রলিঙ্গ গড়া হয়েছে ইতিমধ্যে। বুদ্ধির ছবি ছাপা হয়েছে ভোটপথের মোড়ে মোড়ে। পাণ্ডাজন্য ঘোষের মতো ব্যক্তিত্বও ক্যামেরার সামনে মুখ দেখাতে, কথা বলতে উদগ্রীব। ওদের প্রাণ এমন কাঁদে কী করে? আমার তো কাঁদে না। তাই আমি ওরা নই। বুদ্ধিজীবী নই, কিছু নই। শুধু প্রাণ ধারণের এক কৃষক, এক শ্রমিক, এক রেলযাত্রী আমি। সেই ‘আমি’ কেই যখন নিত্যদিন মরতে দেখি তখন কষ্ট হয়। লাঘব হয় না, মানুষ মারার

নতুন নতুন চালাকিকল দেখে ভীত হই। বিভাজিত সমাজের কাউকে বলা যায় না সত্য, ভাগ করা যায় না মনোব্যথা। যার আস্তিনে আছে পরিবর্তনের হাতবোমা, তাকে নয় চেনা গেল খাড়া বেইমান। কিন্তু ঘোলা জলের শিকারি মধ্যবিত্তকে চিনি কী উপায়ে?

আসলে নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর হলো কার্নিভাল প্রিয় বাঙালির মজাকিস্থান। কলকাতার এতো কাছে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর চাপ বাঙালি অনেকদিন পায় নি। দুর্ধর্ষ বিদেশি খাঁচের হাইওয়ের উপর না হলে কে আর সিঙ্গুরে পিকনিক করতে যায়? নন্দীগ্রাম উত্তরে হলে বলত বেশ করেছে। কামতাপুরিদের উপর অত্যাচারে কেউ কাঁদে না। আরো সিআরপি বহাল হলে কিছু যায় আসে না।

প্রত্যক্ষ রাজনীতি করার মতো এলেম আমার নেই। যদিও দৃশ্যমান সত্যের ছবি আঁকতে পারি মনে মনে, মনের বাইরে বের করতে হলে ছাড়পত্র চাই, সত্যকে রহস্যের চালাকি দিয়ে ঢাকতে হয়। চোখের দেখাকে ঠারতে হয় না দেখার ভাজে। আমার বেরাদিতেও এখন নবীন রাজ-প্রসাদ ধন্য হওয়ার ছড়োছড়ি। কলকাতা আর তার উপকণ্ঠবাসি লেখকরা ওৎ পেতে আছে ‘নসিনালা’ নিয়ে লিখবে বলে। লিটল ম্যাগাজিনও বিশেষ ‘নসিনালা’ সংখ্যার পরিকল্পনা করছে। উপন্যাস হবে, গল্প হবে, বিশ্লেষণী প্রবন্ধ হবে, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিক, সাংবাদিকদের। মেধা, অরুন্ধতী, অগ্নিবিশেদের একজনও থাকবেন। এরপর সিনেমা হবে, নাটক হবে, যাত্রা হবে। বাঙালির একেবারে পৌষমাস, ভরেছে যে পাকা ফসলে। ‘নসিনালা’= নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর, নানুর, লালগড়।

পৌষ আসবে বলে লেখক বন্ধুদের এখন কথা বলার সময় নেই। নরমুণ্ড না হলে যেমন তন্ত্রসাধনা হয় না, বাঙালির ইন্টেলেকচুয়াল হওয়াও হয় না। এখন লেখার জগতে উন্মাদনা, দেশভাগ নিয়ে এমন ছিল না, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে, দাঙ্গা হয়েছে। স্বদেশ থেকে মানুষ বিদেশে এসেছে, এদেশ থেকে নতুন দেশে গেছে, সাধ করে কেউ ছিন্নমূল হয় না। ইতিহাসের সেই নির্মমতা নিয়ে কই, কেউ কিছু করলেন না তো তেমন?

আপাত সত্যের অনেকান্ত দেখে বিভ্রান্ত হলে সৃষ্টিশীলতা কোথায়? ওরকম করে চোখে দেখি না বলে আমিও হয়তো সৃষ্টিশীল নই। অকারণ উত্তেজিত হয়ে রক্তচাপ বাড়াই না। তাহলে, আমি কে? কী আমার পরিচয়? শুধুই এক নিন্দুক, শুধুই পরশ্রীকাতর? সিদ্ধান্ত স্পষ্ট নয় এখনও, দিকচক্রবাল অস্পষ্ট। মনিকণিকায় বিয়োগ শক্তি বাড়িয়ে দিতে হবে, দূর দেখতে

হবে যে! যে-শক্তি সবার অধিগম্য নয়। আমারও হয়তো নেই। তাই, আমি আমার মতো। আমার মতো লেখালেখি করি। ভাবি নিজের কাছে সৎ থাকলাম। যদিও একটিও মনের কথা লিখি না। লিখলে তো নবিজির সমালোচনা করে, মর্যাদা পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের সমালোচনা করে এক আদর্শ, মুক্ত সমাজের কথা লিখতাম। বেঁচেবর্তে থাকব বলে সারা জীবনে একটিও মনের কথা লিখি নি। লেখা তো হয় দুরকমের, এক কলমটি লেখে, অক্ষরজ্ঞানী আমজনতা পড়ে। বলা হয় জনসভার সাহিত্য, ব্রিগেড নয়, পথসভাও ভরে কি না সন্দেহ। আর একরকম আছে, একের বিপরীত এক, বুদ্ধিজেন লেখে বুদ্ধিমান পড়ে। লাইনের মাঝখানে থাকে সত্য। যদিও রহস্যসন্ধানী দ্বিতীয় বর্গটাকে সত্যের কাছাকাছি বলে ধরে নেন তাত্ত্বিক। আসলে কোনটাই নয়। আচরণবিধির সমাজে মন যে বিধি-বিধানের বাইরে, তাই মনের কথা মনেই থাকে।

বুদ্ধিজীবীদের প্রত্যেকেই ক্রান্তদর্শী গ্রিক নাটকের অন্ধ ভবিষ্যৎ-বক্তার মতো। সবাই জানে সমাজের ক্ষত কী করে নিরাময় হয়, কিন্তু কেউ বলে না সাহসভরে। সবাই বলে সম্প্রীতির কথা, হিন্দু-মুসলমান ভাইভাই হওয়ার কথা। কিন্তু ধর্মপুস্তকের বাইরে নিয়ে আসতে পারে না কেউ! ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার কথা বলে সবাই, কিন্তু রাজনীতির মানুষটির ধোপদুরস্ত পরিচ্ছদটি চেয়ারে বসিয়ে ভিতরের খাঁচাটিকে আড়ং ধোলাই-এ পাঠানোর কথা ভাবে না। হ্যাঁ, সবাই বলে ‘করতে হবে’। ভবিষ্যতের অনুজ্ঞা বড় নিরাপদ।

তাই আমি সমাজবহির্ভূত। আমি তাই। আমার কোনো দায় নেই সমাজে, এমন কথাও বলি না। তাই তো সোজা ভাষায় লিখি না ‘এসো জটিল হই’ বলে গান গেয়েছিল কেউ তাই জটিল লিখি। ‘বুঝিলাম, নাই বুঝিলাম জয় তব জয়’ বলে ফেলবে কেউ একজন, দুইজন, কয়েকজন তো পাওয়া যাবে। তার উপর তো আছে জাদুবাস্তব আর পরাবাস্তবের সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। যা পারলাম না, খোদাই করে গেলাম, খুঁজে নিও প্রত্নখননে।

সহজ ভাষার লেখালেখি পড়ে দারিদ্র্য মোচন হয় না। ভ্রষ্টাচার মুক্ত হয় না সমাজ। লেখালেখি পড়ে ধর্মসমাজের বধির কর্ণে মধুবাতাসের শব্দ পৌঁছয় না। তাই, নিজের জন্যই লেখালেখি। নিজেকে নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে ভাষার বর্মে সত্য সাজানোর প্রচেষ্টা।

মনের মধ্যে যে-লেখার আনাগোনা, সে-লেখায় সত্য থাকে আগমার্ক। ছাপার যে-লেখা সেখানে কৌশলে সত্যকে লুকিয়ে সাজানো হয়। সাজাই। লুকোচুরি খেলি। তাই আমার



বেশিরভাগ লেখাই দুর্বোধ্য। দুর্বোধ্য মানে নিজের কাছেও কঠিন। কঠিনকে ভালবেসে কোনো পাঠক পড়ে ফেললে সৌজন্যবশত বলেন স্মার্ট। মন্দ না বলার জন্যই বলা। গল্পকথায় সহজিয়ানা আমি পারি না। ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানে সম্পাদকরা আমাকে বহন করেন।

কেউ কেউ বলেন রণবীর মানে দুটো গল্প। ‘মিনির হাসি’ আর ‘রঞ্জন আসছে’। দুটোই প্রেমের গল্প। আলোচকরাও তাই বলেন। আমি বলি ভুল।

চৌষটি ইংরেজিতে কাছাড় কলেজ পত্রিকার সম্পাদক অরবিন্দ পাল, করিমগঞ্জের ছেলে, লিখিয়ে নেয় গল্প, আমার প্রথম গল্প। ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক সেন্ট্রাল রোডের সুবীর দত্তগুপ্ত স্যার, কী জানি কী একটা টিপস দিয়েছিলেন গল্প লেখার। তখন মনে হয়েছিল দারুণ। এরচে’ ভাল নতুনপড়ির ভাড়াবাড়ি থেকেই শুরু করা যাক। সেও পনেরো বছর বয়স। কবিরাজ বাড়ির ছেলে মন্টুদা চা-সিগারেট খেতে আসে অমূল্যের দোকানে। ওখানে এক বিহারি গোয়ালা দুধ দিয়ে যায়। আমাদের সঙ্গে গল্প হয়। কম্যুনিষ্ট পার্টির গল্প, জ্যোতি বসু, রনদিভে, অচিন্ত্যবাবু, যোশীজির কথা। অচিন্ত্যবাবুর বাড়ি তো একপুকুর পেরোলেই। গোয়ালাদাদা বলে নেতাদের সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসে খেয়েছে ডাল রুটি ভাত ও মাছের ঝোল। তখন কেরল নিয়ে ডামাডোলের পর কম্যুনিষ্ট আন্দোলন এক নতুন বাঁকের মুখে। কানু সান্যাল, চারু মজুমদারের নামে শ্রদ্ধা। জঙ্গল সাঁওতাল, নকশালবাড়ি। লুকিয়ে পড়ার দেশহিতৈষী থেকে দেশব্রতী। সেই সময় মন্টুদার সঙ্গে কথা হয় গল্পকথার কারসাজি নিয়ে। শাস্ত্রবিরোধী হাংরি নিম আরো কী সব। বাসুদেব দাসগুপ্তর রন্ধনশালা আরো পরে হয়তো। কী করে যে শ্যামলদার সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল আমাদের। মানে, আমি ও মন্টুদা। ‘অশোকা’য় নিয়মিত আড্ডা আর শ্যামলদার বাকি খাতায় অমৃতি, রাজভোগ, শিঙাড়া ও চা। অনিশ বেরোবে পুজোয়। আমরা বের করলাম ‘ডাউক’। সম্পাদক তিনজন, ‘ত্রয়ী’। আমি দিলীপকান্তি লস্কর ও মন্টুদা, মানে মহামতি মিথিলেশ ভট্টাচার্য। আরও একজন ছিল, ত্রিশ টাকার প্রথম সংখ্যার যোগানদার। শিলচর ডি সি অফিসের চাকুরে আমার বন্ধু নিধিলাল ধর। লিখিত না কিন্তু লেখক বন্ধু এবং সংগঠক। তখনও বন্ধু, এখনও বন্ধু, এখন করিমগঞ্জে। তপন বলল, সেও লিখবে। সংস্কৃত বাংলা ইংরেজি সাহিত্যের পড়ুয়া তপন ওথেলো থেকে ওফেলিয়ার প্রেম নিয়ে লিখল এক রোমান্টিক লেখা। আমরা বললাম, সলিলকি সাহিত্য। অনেকদিন আমাদের মুখে মুখে ঘুরেছে তপোধীরের এই বিখ্যাত পঙক্তি, ‘ওফেলিয়া, আমি একটি অপাপবিদ্ধ সন্তানের জন্ম দিতে

চাই’। ‘অনিশ’ ঘিরে হলাম আমরা তিন লিখিয়ে বন্ধু ও দিলীপ আর নিধিলাল। অনিশ পূজা সংখ্যায় আমার গল্প লেখার মহড়া হল আবার। মিথিলেশ লিখল, ‘প্রাত্যহিকতার ডামাডোলে প্রতুল’। তপোধীরের লেখা ‘কালিদাসঃ ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব’ এক উদ্ধৃতি পড়েই নতুন করে কথার খোঁজ শুরু হয় আমার। উদ্ধৃতি ছিল এরকম,

‘না পারে বোঝাতে, আপনি না বোঝে’

মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে।’

তপোধীর লিখে জানিয়েছে আমরা যখন লেখালেখি করি তখন সে কিছুই লেখে না। হয়তো শব্দের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সলতে পাকানোর সকালবেলাকে অস্বীকার করা হয়। তপোধীর-বাড়ির গ্রন্থাগার দেখেছি শৈশবে, সেই কাঠের আলমারির ‘পুরুষোত্তম গ্রন্থাগার’ এখনও উত্তর পূর্বাঞ্চলের সর্ববৃহৎ ব্যক্তিগত ‘বিবলিওথেক’। তপোধীরের বই পড়ে প্রস্তুতি, আমার বই দেখে। বই দেখে দেখে, স্বপনকুমারের ‘প্রহেলিকা সিরিজ’, ‘কৃষ্ণা সিরিজ’ পড়ে পড়ে, দস্যু মোহনের বই পড়ে, হেমেন্দ্র রায় পড়ে। নবম দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় লিখেছিলাম এক উপন্যাস। পড়িয়েছিলাম আমার বাল্যবন্ধু সহপাঠী খাসিয়াপাড়ির বন্ধু স্বপন দেবনাথকে। ধন্য ধন্য করেছিল, স্বপন পড়াশুনা ছেড়ে দেয়, চলে যায় যুগীরবন্দ, এখন সে নেই। উপন্যাসটিও নেই, রক্ষা হয়েছে, থাকলে লজ্জার বোঝা বাড়তই। কলেজ সময়ে, ‘দেশ’ পত্রিকায় বিমল মিত্রের ‘বেগম মেরী বিশ্বাস’ শেষ হয়েছে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ‘এই তার পুরস্কার’ জমে গেছে। আর সমীর রক্ষিত, দিব্যেন্দু পালিত, শীর্ষেন্দু, সুনীল, সন্দীপনরা রাজত্ব করছেন। সুবোধ ঘোষ কী রোমান্টিক গল্প লেখেন। বনফুলের ‘ভীমপলশ্রী’। আরও কত, পড়ে পড়ে গল্প লেখার ইচ্ছে হতেই পারে। ইচ্ছে পর্যুদস্ত হয়। ‘শতক্রতু’ তে একটা ছাপা হতেই ট্রিলজি গল্পের সমাপন। আমার তিন অখাদ্য গল্প। এবার বিদায় নেবার পালা, আমার দ্বারা হবে না। বুঝে গেছি লেখালেখি আমার হবে না। ‘স্মাগল’দের দুনিয়ায় সাড়ে নয় নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে ঢুকতে হয়। তেমন কোনো প্ল্যাটফর্ম খুঁজে পাওয়ার জাদুবিদ্যা করায়ত্ত করতে পারিনি যে জীবনে।

আসলে পড়াশুনার ভাঙুর তো তেমন কিছু ছিল না। শিলচরে সাধারণ গ্রন্থাগার বলতে দুটি, ‘অরুণচন্দ্র গ্রন্থাগার’ আর ‘জেলা গ্রন্থাগার’। মনের মতো বই কোথাও নেই বলার অর্থ দায়সারা। তা নয়, বই পড়ার মানসিকতা ছিল না। কোনও রকমে ইস্কুল পাশ, কাছাড় হাইস্কুল



থেকে কলেজ পাশ, সেও কাছাড় কলেজ, নকশাল আন্দোলনে সন্দেহভাজন হওয়ায় বাড়ি থেকে পালিয়ে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তরটা হয়ে যায়। শ্রীঅভয়াচরণ ভট্টাচার্য পাঠশালার প্রথম মান শ্রেণি থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত তপনকে সহপাঠী পাওয়ায় এবং কাছাড় হাইস্কুলে শক্তিদাকে শিক্ষক পাওয়ার সুবাদে জীবন শুধু চাল-তেল-নুন সংসারের গতানুগতিক খাতে বইল না। সাহিত্যের একটা বাড়তি আনন্দপেটিকা বহন করে চলেছি, লেখালেখির এই মায়াভবনে বাসিন্দা হয়েছিলাম বলে জীবন এখনও এত নির্মল এত নির্ভর। লিখে তো বোঝাতে পারিনি কিছুই। কিন্তু তপোধীর এবং শক্তিপদের কবিতা থেকে জোর করে উঠে আসে আমার সমর্পণের পঙক্তি,

‘আমার সমস্ত ভেঙে তুমি দীর্ঘ হতে চাও

তবে নাও যশ, নাও জয়, নাও ঋদ্ধি, নাও’ (তপোধীর)

‘তুমি আছো বলে মেঘ জল,

তোমারই ইচ্ছায় সমস্ত নাস্তিক শক্তি

ঈশ্বরের দিকে ছুটে যায়’ (শক্তিপদ)

আটষট্টি, ঊনসত্তরের বারুদ বুকে নিয়ে জেগে-ওঠা সময়কে ভয় পেয়ে যে দেশ ছেড়েছিলাম, কয়েক মাসের জন্য ফিরে এসেছিলাম সত্তরে, সুখের টানে চাকরি করতে চলে যাই ডিগবয় গৌহাটি লামডিং। ছিয়াত্তরে ফিরে আসি আবার লালা। বিশাল এক অট্টালিকায় একা থাকি আর ভাবি ‘বন্দরের কাল’ এবার বুঝি শেষ হল। লেখালেখি আমার নয়, আমার নয়। কিন্তু ছাড়তে চাইলেই কি ছাড়া যায়। সেই ঘরছাড়া সত্তরের পর থেকে তপোধীর সাতদিনের জন্য ভুলতে দেয় নি আমরা বন্ধু, ভুলতে দেয়নি সাহিত্য আমাদের জীবন, সাহিত্য আমাদের ভবিতব্য। নিয়মিত চিঠি লিখেছে, মুর্তোফোন এর পাঁচ বছর পর্যন্ত অস্বীকার করেছে-যে-কোনো কথাই শেষ কথা। মানে, গত দশ বছর কানাকানিতে কথা হয়, সাহিত্যের পত্রলেখা অঙ্গন পরিত্যক্ত হয়।

তো, সেই সময় মেধাহীন নিশিদিন ভাবি কী লিখি, কী লিখি। শ্রীরাধার মতো অবস্থা, যা কিছু কালো তাতেই কানু দেখি। সহজ পড়া পড়েছি, কলকাতার কাগজ লিটল ম্যাগাজিন,

দেখছি ওরা সমসাময়িকরা কেমন লিখছে। চিত্ত ভরে না, ভাবি ছেড়েই দেব কালো অক্ষরের পিছনে ছোটোছুটি। কিন্তু মূলধন বলতে তো একটাই, লাইনের মাঝখানে না বলা কথা অনেক গুঁজে দিতে পারি কিছু না লিখে। রন্ধনশালার এই রেসিপি কাউকে দেওয়া যায় না কিন্তু ভুরিভোজের একটি পদ হয়ে যায় উপাদেয়। তাই, উপনিষদের সত্য মেনে, ইট, কাঠ আর যুবক-যুবতির মধ্যে ব্রহ্মরূপী ছোটোগল্প দেখতে শুরু করি। আর প্রেমের গল্প সাজাই, প্লটের পড়ে প্লট। হয় না, আরও পড়ি। বুঝতে পারি ছোটোগল্পে প্লট ব্যাপারটার তেমন প্রাধান্য নেই আমার কাছে। ‘এক যে ছিল’ বলে শুরু করার ব্যাপারও নয়, আর লাইনের মাঝখানের অকথিত কথাও নয়। বুঝতে পারি ঐ ‘অকথিত’ শব্দটায় রয়েছে সব রহস্য, কিন্তু ধরতে পারি নে। বুঝতে পারি একটি ছোটোগল্পে যা লেখা হচ্ছে তার পাশাপাশি রয়ে যাচ্ছে সেই লেখার অন্য একটি পাঠ, যা ভিন্ন পাঠকেরা নিজের মতো পড়ে যাচ্ছে। এক লেখা বহু হচ্ছে, আবার এক থেকে যাচ্ছে অবিকল। যা সীমিত মেধার আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই, টা-টা।

কিন্তু ছাড়াতে চাইলেই কি ছাড়া যায়। লালা শহরে তখন আড্ডা চলছে। ছোটো শহরে তখন স্টেশন মাস্টার, পোস্টমাস্টার আর ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের খুব সম্মান। আর বোঝার উপর শাকের আঁটি হয়ে কিছু না লিখেও বরাক উপত্যকার গদ্যশিবিরের সক্রিয় সদস্য, শতক্রতু পরিবারের একজন, অনেকেই নামে চেনে। তপোধীর ততদিনে উপত্যকায় এক সমান্তরাল সাহিত্য-সমবায় গড়ে তুলেছে। সমান্তরাল শব্দটি অর্থহীন হলেও একটা লড়াই কোথাও ছিল, এখন কিছুই নেই, কেউ নেই দৃশ্যমান, সে একাই সব গুল্ম ছাড়িয়ে মহীরুহ একমাত্র। তাই, সেইসময়ে একটা প্রতিফলিত সম্মানের অধিকারী ছিলাম। হাইলাকান্দি থেকে আসত আশু, চন্দ্রপুরে ওদের বাড়ি ছিল, কাছাকাছি কোথাও মাস্টারি করত। ‘বেলাভূমি’র সম্পাদক আশুতোষ দাস তার স্বভাবের কোমলতায় প্রিয় হয়েছিল। লালা শহরের প্রাণকেন্দ্রে আমার বিশাল বাসাবাড়ি। বন্ধু মানিকলাল চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছিল ব্যাঙ্ক। মানিকও আসত মাঝেমধ্যে সপরিবারে, ছোট্ট মেয়ে চৈতি ছিল মিষ্টি। জেলা-জজ হয়ে অবসরপ্রাপ্ত এখন মানিক। লালা কলেজের অধ্যাপক আবুল হোসেন মজুমদার, জহর সেন এদের সঙ্গে আড্ডা হত। চন্দ্রিকা প্রসাদ গুল্লা ব্যবসায়ী ও সাংস্কৃতিক কর্মী, বললেন নাটক করবেন, শের আফগান-এর মহড়া হলো, মঞ্চস্থ হলো না কোনো কারণে। কলাভবনের সদ্য স্নাতক ময়নুল তখন নেহরু শিক্ষক, তারও বাড়ি লালা। শিলং-এর এক মহিলা কবির কবিতা শোনাতে, সেই কবিকেই বিয়ে করে ফেলল একদিন। চলেও গেল একদিন, একমাত্র মেয়ে রিখিয়া ছিল মিষ্টি দুরন্ত, এখন তো

চিকিৎসক, জানি না বাপের উত্তরাধিকার কতটুকু বহন করছে। এক রবিবারে লালার স্কুলের পিছনের মাঠে ক্রিকেট খেলার আসর বসল, আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে গেলাম, সঙ্গে তপোধীর। উপভোগ্য পরিবেশে তপোধীর ধারাবিবরণীর মাইক হাতে তুলে নিল, লালার ক্রীড়ামোদী মুগ্ধ হয়ে শুনল। বিজিৎদার হাইলাকান্দি যাই, আড্ডা হয়, মিথিলেশের বিয়ে হয় সরসপুরের রুবির সঙ্গে, সাহিত্য জগতের তারকা সম্মেলন হয় হাইলাকান্দিতে। অনুপস্থিত বউদির বাড়িতে দুইরাতের লাগাতার আড্ডার ইতিহাস এতদিন জানতাম আমি আর বিজিৎদা। ‘সাহিত্য’ তখন কবিতার, গদ্য লিখতে বলে বিরত হলেন বিজিৎদা। বরাক উপত্যকায় গদ্যসাহিত্যের দুই ভগীরথ শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী ও তপোধীর এবং গদ্য শ্রমিকদের কথা বিজিৎদা ছাপালেন ক্রোড়পত্রে। অরুণ শিলং থেকে হাইলাকান্দি এলে উৎসব হয় লালায়। আসে তপোধীর, মিথিলেশ, শেখর। অরুণ চন্দ সুলেখা কালির বোতলে ভরে নিয়ে যায় কবিতা-সুধা। কবিতা হয়, সাহিত্য হয়, সুধাময় বন্ধুত্ব হয়। বিচ্ছেদ হয় হাইলাকান্দি শ্মশানে, শ্মশানরাতে আমি তপোধীর ও মিথিলেশের বোবা লাগা এখনও যায়নি। এখনও আমরা বন্ধুকে ডাকি ‘অরুণ ফিরে আয়’, ক্রোড়পত্র ছাপাই বারবার।

সেইসময়ে তপোধীর শিলচরে সদ্য বিবাহিত। বন্ধু পত্নীর সঙ্গেও প্রীতির সম্পর্ক জমে যায়। শনিবার লালার থেকে যাই স্টেট ট্রান্সপোর্টের বাসে। চারজনের সাহিত্যের আড্ডায় স্বপ্না ভট্টাচার্যকে পান্ডা দিইনি। লেখালেখিতে আমরাই যে শেষ কথা। কী ভুল হয়েছিল, হয়তো আমাদের ভুলের জবাব দিতেই আজ বরাক উপত্যকার ছোটোগল্পকারদের মধ্যে একতম তিনিই। দেশভাগ পরবর্তী লড়াই আর মূল্যবোধের অসাধারণ গল্প ‘উজান’ দিয়ে যার আত্মপ্রকাশ, তার গল্পবিশ্ব তো ভিন্নতর হবেই। সমাজ ও সাহিত্য নিয়ে তার ব্যতিক্রমী তথ্য মুক্ত চিন্তার ফসল হয়ে সদ্য বেরিয়েছে ‘জীবনানন্দের নারীকল্প’, ‘সমান্তরাল’ গল্পগ্রন্থের লেখক এবার একটি উপন্যাস লিখবেন। আমাদের আড্ডায় শেখর দাশকে মানিয়ে চলা একটু কষ্টকর ছিল, আবার শেখর ছাড়া জমতও না। একটু সৃষ্টিছাড়া ছিল তার কথা বলা, সম্পর্ক, আর শতক্রতুর লেখায় ছিল দারুণ পেশাদার। বাঁধের নিচে নদীর পারে শেখরের বাড়ি ‘রিভারভিউ’ আমাদের আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল, আর কেন্দ্রমনি ছিলেন শেখরের বাবা, মেশোমশাই আমাদের পেলে আমাদের বয়সী হয়ে যেতেন, আবার একটা রাশভারি আবরণও ছিল, মাসীমাকে আমরা একটু ভয়ই করতাম। আমাদের নতুনপট্টি পাড়ায় থাকত মন্টুদা, মনোরঞ্জন কবিরাজের ঔষধালয়ের পিছনে ছোটোভাই মহেশ কবিরাজের থাকার জায়গা। মন্টুদার বড় ভাই কেশবদা

আমার দাদার বন্ধু, ছোটো বন্ধু আমাদের সমবয়সী। শতক্রতুর দরকারেই হয়তো জ্যেষ্ঠতাতের বাড়ি থেকে উৎখাত হয়ে চলে যায় মালুগ্রাম থানার পিছনে ভাড়াবাড়িতে। ওখানে ননীদার চায়ের দোকানে পুনর্মিলন এবং ‘শতক্রতু’। আর তপন বরাবরই নেতাসুলভ উদার, বিশ্বের ভার নিজের কাঁধে নিয়ে নেয়। নিয়েছিল বলেই ‘শতক্রতু’, নিয়েছিল বলেই আমাদের লেখালেখি, শেখর দাশ-এর আবিষ্কার, কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে ধার নিয়ে লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ। তখন সবাই প্রেম করত। নীলিমার সঙ্গে জোর প্রেম মিথিলেশের, ক অক্ষর একজনের সঙ্গেও কিছুদিন। শেখরও জানি একজনের সঙ্গে। তপোধীর কী করে এতসব রোমান্টিক গল্প লিখল বিয়ের আগে, সে-খবর যারা জানে তারা জানে। সুন্টুনি মুন্টুনি ডায়লগ লিখল, ‘শান্তা, শানু, শানুয়া, তুমি আজ শাম্পু দিয়েছ চুলে।’ মিথিলেশ ‘ছারপোকা’ র পর লিখেছে শুধু জীবনানন্দকে ধ্রুবতারা করে। বরাক উপত্যকার মধ্যবিভূও নিম্নবিভূ জীবনের টানাপড়েন। শেখর বরাবর স্মার্ট। শেখর ফ্রেম গড়ত, ফ্রেম জুড়ে জুড়ে ছোটোগল্প। একেবারে সিনেমা। ভাল লাগত যতক্ষণ ‘শতক্রতু’তে লিখেছে। এরপর আর ভাল লাগল না। আমারও তখন হরেক রকম, শিলচরে কিছু, ব্রহ্মপুত্রের দেশে এক এবং কলকাতার মিনির সঙ্গে একতরফা। একতরফাতে মন মজল। বন্ধুদের প্রেম পর্বের দর্শক হওয়া আর লালায় ফিরে উদাসী রাত কাটিয়ে দেওয়া। তখনই মনে হল, লেখালেখি ছাড়লে চলবে না, মিনিকে পাব না। ঠিক করলাম, আমার একটা ঘরানা হোক, আমার মতো লিখব। ফুপ লেখা লিখতে লিখতে বিরক্ত হচ্ছি, আর মনে মনে লিখে যাচ্ছি নানা কথা। মিনির জন্য মনোদুঃখের এপিট্যাফ। মিনিকে বলতে পারিনি কিন্তু মিনির সঙ্গে দীর্ঘ ভ্রমণ করেছি, হাবড়া, জয়নগর গেছি। কফি হাউসে গেছি। পাতিরাম থেকে লিটল ম্যাগাজিন কিনেছি হাথরি, শাস্ত্রবিরোধী। শাস্ত্রবিরোধীদের সঙ্গে মনের মিল হয়ে গেল, এই দশক, চিল ইত্যাদি। এক নতুন কথাভাষা পেয়ে গেলাম। তপোধীরের চূড়ান্ত রোমান্টিকতা, মিথিলেশের ভাঙা সময় নিয়ে উদাসীনতা, শেখরের ফ্রেম আর আমার ইঞ্চি মেপে গল্প লেখার ইস্কেল। একান্ত আপন কথাভাষা সম্বল করে শ্রীগণেশ হয় আমার লেখালেখির।

আমি তো আর পাশ্চাত্য রীতির অনুকরণে আত্মজীবনী লিখতে বসিনি। বরং বহমান সময়ের ‘চালি’ বেয়ে যেতে যেতে কখনও উজানে ফিরি কখনও তরতরিয়ে ভাটিতে। সময়ের মধ্যে থাকাটাই তো পারস্পর্য, এর বাইরে কোনও দায় নেই।

এবার তাই আমার কথা, আমার কয়েকটি গল্পের কথা বলেই করি টাইমপাস। ‘মিনির হাসি’ শতক্রতুতে বেরিয়ে গেল, আকাশবাণীতেও পঠিত হল, সাহিত্য বিভাগের প্রযোজক শুল্কবৈদ্য মহাশয় বললেন, ‘গোল্ডেন ভয়েস’। মানে কী? গল্প ভাল লাগে নি? আমার কণ্ঠস্বর ভাল। পাঠকের ভাল লেগেছিল, ওই একবারই। একবার পায় তারে, পায় নাকো আর। ভাল লাগার হাততালি শুনেছি, বারবার ছেপে বেরিয়েছে, এ কাগজ ও কাগজে, বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থে। তপোধীর তখন উত্তরবঙ্গ শিলিগুড়িতে। শিলিগুড়ির এক দৈনিকের রবিবারের পাতার ভারপ্রাপ্ত। ছাপিয়ে দিল ‘মিনির হাসি’ ইলাস্ট্রেশন সহ। ভাবি, ওষধি লেখার লেখক হয়েই কি কাটিয়ে দিতে হবে জীবন? ‘মিনির হাসি’র পর আবার আকাশবাণীর আমন্ত্রণ। কোথায় লেখা? কলকাতার মিনিকে শিলচরের পার্ক রোডে নিয়ে এলাম এক শনিবার। তপোধীর, স্বপ্না, কখনও মিথিলেশ-শেখর সহ আমরা যাই বুদ্ধ সেন-এর রেস্টুরেন্টে। আলো-ছায়ায় ঘেরা এক মনোরম পরিবেশ ছিল খাওয়া-ঘরের। সেই অভিরূপের রেস্টোরাঁ। একই ফর্মাটে লিখে ফেললাম, আবার হিট, আবার শতক্রতু।

অনেকদিন পর শুনে অবাক হয়েছি বরাক উপত্যকার সাহিত্য সংস্কৃতির দুই জ্যোতিষ্কের ভাল লেগেছিল ‘রঞ্জন আসছে’। দেবাশিস তরফদার ও শুভপ্রসাদ নন্দী মুজুমদার ব্যক্তিগত জীবনে নিকট-আত্মীয়। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া দুজনের খুব মনে ধরল, দুজনেই সিদ্ধান্ত নিল চিত্রনাট্য করবে। গল্প লিখে এতবড় পাওনা কখনও পাইনি। শুভর মুখ থেকে শুনেছি, এর আগে বিশ্বতোষ বলেছে। দেবাশিসকে চিনতাম না।

এবার অন্য কথায় ধান ভানা। আমার একটি এলআইসি পলিসি হারিয়ে যায়। তখন শিলচরে চাকরি করি। চিঠি দিয়েও কিছু হয় না। তখন একদিন মেহেরপুর এলআইসি অফিসে চলে যাই লড়াই করব বলে। বিভাগীয় অফিসার, তাই বললেন যা যা বলতে হয়, ‘দেখছি,’ ‘অবশ্যই পেয়ে যাবেন’ ইত্যাদি। হঠাৎ আমার নাম জানতে চাইলেন আধিকারিক। নাম শুনে ফাইলপত্র গুটিয়ে রাখলেন। ড্রয়ার তালা লাগালেন, কী ব্যাপার? পাঁচটা তো বাজে, তার মানে আজ আর হবে না। ভদ্রলোক বললেন, চলুন। আমি হতভম্ব। আবার বললেন, চলুন আমার বাড়ি সামনেই। আমি আর কোনো প্রশ্ন করিনি, কে আপনি, কেন আপনি। মানে, কেন যাব। তখন আমার মাথায় হারানো পলিসি। রাস্তায় যেতে যেতে নাম জেনে গেছি। স্কুল লিভিং পরীক্ষায় তখন পর্যন্ত বাংলায় সবচে’ বেশি নম্বর পাওয়া ছাত্র দেবাশিস তরফদারের নাম সবাই



জানে। জানে কবি দেবশিস কে, মুক্ত গদ্যের কারিগর দেবশিসকে। কবি সেদিন তার লিংক রোডের ভাড়াবাড়িতে শোনালেন অনেক প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত লেখা। তার স্ত্রীর হাতে তৈরি খাদ্য ও পানীয় চা। এক সময় ‘রঞ্জন আসছে’ গল্পের চিত্রনাট্য বিষয়েও বললেন। যদিও পরবর্তীকালে দেবব্রত চৌধুরীও আকাশবাণীর জন্য নাট্যরূপ দিয়েছিল, ‘রঞ্জন আসছে’র। হয়তো গল্পের চিত্ররূপ কিংবা নাট্যরূপ সফল না হওয়ার জন্য গল্পের কোনো কাঠামোগত ত্রুটিই দায়ী ছিল। তো, লেখালেখির এই বিরাট পাওনাটুকু ভুলিনি কোনোদিন। পাঠককে কি এরপরও বলে দিতে হবে যে আমার হারানো পলিসিটা পরদিনই হাতে হাতে পৌঁছে যায় আমার ঠিকানায়।

ওই ঘরানার আর একটি গল্পও লিখেছিলাম সেই সময়ে। আমার লالا সময়ে। বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত-এর একটি কবিতার লাইন ছিল এরকম, সুধা শ্যামলিম পারে তরমুজ খাওয়ার মতো... ইত্যাদি, মানে চুষন। সেই শুরু বিস্ফোরক শব্দাবলীকে ঢেকে ঢুকে রাখার কারসাজি। গল্পের নাম ছিল ‘তরমুজ’। বীরেনবাবুও অবাক করে দিয়েছিলেন একদিনের পরিচয়ে। মালিগাঁও-এ ওর বাড়ি গিয়েছিলাম, সঙ্গে তপোধীর। তপোধীরের সঙ্গে। বলেছেন আমার দুটো গল্প পড়েছেন, এবং মুগ্ধ হয়ে পড়েছেন। তো এই শেষ। উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে যাওয়া। এরপর স্বপ্না ভট্টাচার্য, তপোধীর এবং অমৃতলোক সম্পাদক সমীরণ মজুমদার ভাল বলেছে। প্রমা সম্পাদক সুরজিৎও বলেছে। বন্ধুত্বের দায়।

পাঠক নেই বলে আরও কয়েকটি গল্প নিয়ে সাতকাহন লিখব। আমার নিজের লেখা নিয়েই। তো, শতক্রতু থেমে গেল একসময়, যেমন থামে। এরপর আর বড় মাপের গল্প ছাপার কাগজ রইল না বরাক উপত্যকায়। বিজিৎদা আরম্ভ করলেন বটে। সাধুবাদ তাকে। এখনও চলছে ‘সাহিত্য’। বরাক উপত্যকায় অনিশ, শতক্রতুই ছোটগল্পের মাত্রা বেঁধে দিয়েছিল। পঞ্চমে সুর বেঁধেছিল মিথিলেশ, শেখর, অরিজিৎ। বদরুজ্জামান চৌধুরী লিখলেন তার সমাজের কথা। ‘দেওলা’ গল্পের সুব্রত অনেকদিন লেখে না, কিংবা আমার চোখে পড়ছে না। অমিতাভ লিখছে, দীপেন্দু কেন লেখে না তার জবাব সেও দিতে চায় না। হয়তো রাহুল দাস নিজেকে প্রস্তুত করছে, বিস্তর পড়াশুনা করছে, লেখার রন্ধনশালায় ঢুকে গেছে কিছু করে দেখাবে বলে। অপেক্ষায় আছি। ‘শতক্রতু’ থেমে যাওয়ার কথা লিখছিলাম। রত্নদীপ নামে একজন আছে, আছে রূপরাজ, ওরা লিখছে। আবার শুরু হয়েছে। হয়তো আবার লিখব যেমন লিখছিলাম। ‘শতক্রতু’ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর পশ্চিম বাংলার কাগজে লিখেছি অনেক। আর সেসব লেখা



মানে এক একটা লং ড্রাইভ। সোজাসোজা লেখা, সোজা ব্যাটে ফিল্ডসম্যান বিহীন লংঅনে তাড়। মহাসড়কে দৌড় শুধু, উচ্চাবচতাহীন একমুখিন স্টোরি। মানে এক একটি গোল গল্প। আমার গল্পের বই ‘বোকা কাশীরাম কথা’র সমালোচনা করতে গিয়ে খুব ফাঁপরে পড়েছিলেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী। একদিকে সম্পাদককে দেওয়া কথা অন্যদিকে রণবীরের সঙ্গে পরিচিতি, দূরন্ত সেই বুদ্ধিধর গল্পকার ছড়া-কথার অবতারণা করে লিখলেন ‘কী কথা?’ ‘ব্যাঙ-এর মাথা’ আমার লেখাকে ব্যাঙের মাথা বলায় অখুশি হওয়ার কারণ ছিল না, কারণ স্বপ্নময় আমার প্রিয় গল্পকার, অকারণ মিষ্টি কথা বললে অশ্রদ্ধাই হত। তবু এক জীবনে সেধুরি হাঁকতে না পারলেও টুকটাক দৌড়েছি তো, আন্মোও দৌড়েছি বলার সুখ একটু ভাগ করে নিলে আগডুম বাগডুমের লেখা আয়তনে তো বাড়বে।

গল্পকথা ‘বোকা কাশীরাম কথা’য়ও প্রেম। প্রেম রিভিজিটেড। তখন সবে কম্পিউটার এসেছে জোরকদমে। কম্পু নিজে মজা। লেখায় একটু জটিল হয়ে যাই, আমি সাধাসিধে লিখতে পারি না। ভাবি পাঠকের মন্দ লাগবে না জটিলতার জট ছাড়াতে বাবুই পাখির সূঁচ খুঁজতে। আসলে আমি থোড়াই লিখি পাঠকের জন্য, আমার পাঠক আমি, আর আমার সম মনের দু-একজন, যাদের কথা আগে বলেছি। প্রথম লেখাটা কিন্তু একেবারে আমার, একেবারে ‘ওর’ মানে কাঁচা খনিজ। ওটা সত্যি কাঁচা সোনা। শব্দের সত্য, বাক্যের সত্য থাকে অনেকখানি। পাঠকের কপিতে থাকে চালাকির খাদ, নইলে যে গয়না হয় না। আমার কম্পিউটারের নাম কাশীরাম। কাশীভাই নায়ক-নায়িকার প্রেম এবং পরকিয়া রেগুলেট করে। বৈষ্ণবধাম নবদ্বীপে ছিলাম ছমাস চাকরি সূত্রে একাকী, ব্যক্তিগত বিরহ জমিয়ে ক্ষীর বানালাম। বিয়ের পর স্ত্রী ছাড়া প্রেমের রমণী পাই নি বলে দুটুকরো করলাম এক নারীকে। প্রেমের ফণ্ডিনষ্টির যে-অংশটুকু স্ত্রীর কাছে পাইনি, ঢুকিয়ে দিলাম দুনস্বরে। ভাল বলল না, বলল মন্দ না কেউ কেউ। স্থায়ী পাঠকরা বলল বেশ। ত্রিপুরার ‘মুখাবয়ব’ ছাপল। দেবব্রত দেব সম্পাদক। দেবুর ছোটভাই রতু, শুভব্রত অক্ষর প্রকাশনীর কর্ণধার, আমার একমাত্র বই-এর প্রকাশক। ত্রিপুরার আরও তিনজন দুলাল ঘোষ, অনুপ ভট্টাচার্য আর শ্যামল ভট্টাচার্য আমার প্রিয়জন। নকুলের সঙ্গে, সমরজিতের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না। শুভাশিস ও প্রবুদ্ধের সঙ্গে মুঠোফোনে কথা হয়। কিশোরের সঙ্গে দেখা হয় না। জয়া লেখেন দারুণ, দেখা হয় নি। মুখ্যত দুলালের উৎসাহে অ-গেরস্থ আমার বই প্রকাশের প্রথম উদ্যোগ হয়। কারণ তপোধীর স্বপ্না ততদিনে হতোদ্যম হয়ে আমাকে দিনে ২৫ বার গালাগালি করে জলপান করা শুরু করেছে।

আমার যে ধনুর্বিদ্যা পণ, লেখালেখির জন্য কাগজ কলম ছাড়া অন্য কোন অর্থব্যয় করব না। বই, প্রকাশের জন্য তো নয়। কেন, কে কিনবে, কিনে পড়বে আমার বই? আর এমন কোনো প্রকাশকও নেই যে গাঁটের পয়সা দিয়ে বই বের করবে। সমীরণ মজুমদারও চেষ্টা করেছিল। তাই দেরি। শুভব্রতকে ধন্যবাদ, বের করল। প্রথম বই বেরোতে ভালই লেগেছিল। লেখক লেখক ভাব। তারপর কেটে গেছে। আসলে যখন লিখি, তখনই ঘর করি পাত্রপাত্রীদের সঙ্গে, ছাপার পর ভুলে যাই অকিঞ্চিৎকর ভেবে। এমন লেখা যে কেউ লিখতে পারে। আমি আলাদা হলাম কোথায়।

কাশীরামেরও আগে, কলকাতা এসেছি সদ্য সদ্য শিলচর থেকে। কফি হাউসে যাতায়াত, নিত্যদিন পরিচয় নতুন নতুন লেখক সম্পাদকের সঙ্গে। আফিফ ফুয়াদ করে গদ্যের কাগজ ‘দিবারাত্রির কাব্য’। ‘অমৃতলোক’ সম্পাদক সমীরণ মজুমদার। ‘প্রমা’ সম্পাদক সুরজিৎ ঘোষ। এবং মুশায়েরা সম্পাদক সুবল সামন্ত। ‘এবং এই সময়’ সম্পাদক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘বাজিকর’ এবং ‘শিকড়ের সন্ধানে’ নামে দুটি গল্প ছাপিয়েছেন অরুণবাবু, এত খারাপ গল্প কেউ লেখেনি আজ পর্যন্ত। যেমন লালনমঞ্চ সম্পাদক দিলীপকান্তি ছাপিয়েছে একটি ‘তুয়াতারা’। ‘পূর্বদেশ গল্পপত্র’ সম্পাদক ছাপিয়েছেন ‘লুয়া’ এবং ‘একটি নিমন্ত্রণের জ্যামিতিক পরিণতি’, অক্ষরবৃত্ত সম্পাদক কপিশকান্তিও ছাপিয়েছিল একটি। আমার লজ্জাও নেই। এত খারাপ গল্প লিখছি আবার কলকাতার বন্ধু লেখকদের লেখা পড়ে ভাবছি ওরা ‘মেধা’হীন। তাহলে আমি কী? আমিও তো লেখক নই, লেখার ভান করছি। আমার লেখা ছাপুন বলছি না কাউকে, কিন্তু কফি হাউসে পরিচিত সম্পাদকের টেবিলে বসার অর্থই তো দাঁড়ায়, তাকে অনুরোধ করতে বাধ্য করা, একটা গল্প দেবেন। এই করে করে লেখক। মানে স্টক ক্লিয়ারেন্স। এর মধ্যে আমার পছন্দসই একটা দুটো লেখা হয়ে যায়। মন খারাপ থেকে উঠে আসে লেখা। মাঝারি মেধা আর নিম্নমেধার কফি হাউস লেখকদের দেখে মনে হয়, আমি কম কিসে। বাঙালির অলকাপুরী কলকাতায় এসে এমনিতেই মন খারাপ সমাজে ও রাজনীতির দৈন্য দেখে। শিলচর থেকে কলকাতা এসেছিলাম মুক্তমনা কম্যুনিষ্ট-এর দেশ পাব বলে। কী পেলাম? আঙুলে আংটি পরে, গলায় পৈতে ঝুলিয়ে, ইনশাল্লাহ বলে, জয়গুরু বলে, নারকেল ফাটিয়ে শিলান্যাস করা নবীন সমাজতন্ত্রীরাই রাজা হয়ে বসেছেন। অপ্রাতিষ্ঠানিক লেখকদের প্রতি যে শ্রদ্ধা ছিল তা অচিরেই ঘুচে গেল, কারণ প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার কারণ আদর্শগত নয়, বরং মেধাগত। যারা মেধার উপরের সিঁড়িতে পা রেখেছেন, তারা বেশ দু নৌকোয় দেশ আনন্দবাজারের সঙ্গে প্রমা,

অনুষ্ঠাপেও লিখছেন। আবার একটা নতুন সময় হলো, মনে হল এদের থেকে ভাল লিখতে পারি। মনে হওয়া আর লেখা এক কথা নয় তবু ইট-কাঠ যোগাড় করে গড়লাম এক অটালিকা। নাম দিলাম ‘দুন্দুবুড়ি কথা’। তপোধীর পড়ল, স্বপ্না পড়লেন শিলিগুড়িতে। তপোধীর তখনও তেমন খ্যাত নয় কলকাতায়। সদ্য উত্তর আধুনিক নিয়ে অঞ্জন সেন, অমিতাভ গুপ্তদের সঙ্গে অভিবর্তন হয়েছে। শিলিগুড়ির ‘সাম্প্রত’ য় লেখা হয়েছে বিতর্কিত লেখা। তখনও বালুরঘাটে ‘মধুপর্নী’ র উৎসবে দেখা হয়নি ভগীরথ, অনিন্দ্য, মাধব, কিন্নর, অভিজিৎদের সঙ্গে। দুন্দুবুড়ি স্বপ্নার এমন ভাল লাগল যে ছাপার আগেই আমি মৌখিক পত্রিকা হয়ে গেলাম। বারবার পড়ছি বন্ধু, বন্ধুপত্নীর সামনে, ওদের প্রিয়জনদের সামনে। আমরা শিলিগুড়ি যাওয়ার আগেই স্বপ্নাদেবী ওখানের, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নন্দিতা ভট্টাচার্যকে পড়ে শুনিয়েছেন। শিলিগুড়ি পৌঁছতে আর একবার। উত্তম পাঠক নন্দিতাদেবী এখন কলকাতায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিল্পী সাহিত্যিক সংগঠক ইন্দ্রদার স্ত্রী। বারবার পড়ে পড়ে তপোধীর-পত্নীর গল্পের অনেক অংশ মুখস্থ হয়ে গেছে। প্রমার সুরজিৎ-এরও ভাল লাগল। ছাপল এবং সেই প্রথম লিখে সম্মান দক্ষিণা পেলাম। আসলে উত্তর আধুনিকতার ছোঁয়ায় লেখাটি হয়ে উঠল। ঐতিহ্য জুড়তে গিয়ে অসংগতিও হয়েছে কিছু। বরাক উপত্যকার কথা, কলকাতার কথা, কথার ভিতর কথা আর রূপকথা মিশিয়ে এক মায়াবী ভাষায় লিখেছিলাম ‘দুন্দুবুড়ি কথা’। কিছুটা শৈশব স্মৃতি, শীতের রোদুরে উঠোনের কোনে মাটির বুরো ঢিবি হতো ছোটো ছোটো টিলার মতো। আর আমরা ঢিবির চারপাশে হাত ঘুরিয়ে সুর করে বলতাম,

‘দুন্দুবুড়ি নাচ করে

সাহেব দেখে সেলাম করে’।

এরকম ক্রমাগত হাত ঘোরাতে ঘোরাতে ঢিবির উপর কালো সাহেবের উদয় হত। ভিতর থেকে উঠে আসত পিপড়ের মতো কালো পোকা, দুন্দুবুড়ি যার নাম। সব ঠিকই ছিল, কিন্তু ঐতিহ্য গুনতে গিয়ে কাজলরেখার গল্পটা মিলল না। পাঠকও ধরতে পারল না, আসলে পাঠক কোথায়? ব্যক্তিগত পাঠকরা তো মুগ্ধ, ভুল ধরার মানসিকতা নেই। পড়েছিল, সুব্রত কুমার রায়, খুঁটিয়ে পড়েছিল। সুব্রত এক দুরন্ত কথাকার বরাক উপত্যকার, বলা ভাল বাংলা ভাষার। তত্ত্ব জানে সুব্রত, লেখায় তত্ত্বরূপ বেরিয়ে যাওয়া মানে বাঁশ বিচালি দৃশ্যমান হওয়া। ‘দেওলা’ কিংবা ‘পলাশ দাহ’র মতো গল্পের লেখকের কাছে বাংলা সাহিত্যের প্রত্যাশা আছে।

আমারও বুদ্ধিমান পাঠক পেয়ে ভাল লেগেছিল। কিন্তু ওপর ওপর পড়তে গিয়ে সুব্রত ভুল করেছিল। আমার লেখায় গ্রন্থনার ভুল ধরেছিল, আমি যে ইঞ্চি-মাপা লেখক, ওরকম ভুল করি না, দালান কোঠার স্থাপত্য ভুল করি না, শুধু প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারি না আবাসিকের।

কাশীরামের গল্পে আমার বেশি কথা বলার প্রবণতার সমর্থনে লিখেছিলাম, ‘অল্প কথায় হয় না গল্প কথার সাজ’। একবার কথায় কথায় বলেছিলাম ত্রিপুরার কথাকার শ্যামল ভট্টাচার্যকে। বলেছিলাম আমাদের দেশের ছোটো পত্রিকাগুলি ক্ষীণকায় হয় ঐতিহাসিক কারণে। আর পাঠকের জন্য বরাদ্দও থাকে কম পাতা। তাই উত্তর পূর্বাঞ্চলে কবিতার পত্রিকাই সব। গল্প উপন্যাস হয় না, যদিও বা গল্প দু-একটা হয়, সে-গল্প পোলিওর শিকার হয়। অল্প কথায় হবে না বলেছিলাম ওকে। শ্যামলের মনে ধরেছিল, প্রায়ই বলে, যদিও ত্রিপুরা, গৌহাটি, বরাক উপত্যকায় এখন বদলে গেছে সব। মুখাবয়ব, পূর্বদেশ গল্পপত্র, শতক্রতু এবং সাহিত্য এখন বড়ো বড়ো গল্পের সঙ্গে গল্পের অ্যাপ্রিসিয়েশনও ছাপায়। অল্প কথায় লিখতে পারার কারুকাজ শেখা হলো না বলে লিখেছিলাম ‘লবণ হ্রদের সীমানা’ নামের এক বিশাল ছোটোগল্প। আমার মতো করে বলতে পারি ‘গল্প’ লেখেছি ভাল। আমার সব গল্প যেমন ‘খুল যা সিম সিম’। চাবিকাঠি আমার কাছে, চিচিং ফাঁক আমি জানি, পাঠক শুধু আলু ফাঁক, বেগুন ফাঁক করে ক্লান্ত হয়ে দুয়ো দেয়। মিথিলেশ একবার দারুণ কথা বলেছিল, ওকে বলেছিলাম, তোর গল্পের পাত্রপাত্রীরা নড়াচড়া করে কম, রিক্রায় চড়ে বসলে যেন মনে হয় আজন্ম রিক্রাবাসী সে, রিক্রা চড়ার প্রক্রিয়াটা নেই কোথাও, সরাসরি বিষয়ে চলে যাস। মিথিলেশ বলেছিল, ‘হ্যাঁ হয়তো ঠিক, আমি ভাবি আমার পাঠক সব জানে’। একজন পাঠকের উপর নির্ভর করে বিবরণ বা ডিটেলস কমাচ্ছে, অন্যজন, আমি ডিটেলস ভারাক্রান্ত করে গল্পকেই গুলিয়ে দিচ্ছি। তাই পাঠকের সামনে মুখ খুবড়ে পড়েছে ‘লবণ হ্রদের সীমানা’। চেয়ে নিয়েও যা সম্পাদক ফুয়াদ ছাপায়নি সাহস ভরে। গল্প একটা ছিল নাগরিক, আমার বাড়ি আর সল্টলেকের বিভাজন রেখা হয়ে আছে একটি খাল। কেঁপুপুর খাল। মিথ্যের ভিত্তে জীবন সাজাতে গিয়ে সব হারানো এক দম্পতির কথা নিয়েই গল্প। কথা সাজাতে গিয়ে মনে হয়েছে পুরনো কথকের মতো লিখছি, দেশীয় লেখকরা যেমন লিখতেন কথা সরিৎসাগর। জটিল হয়েছে পাঠক ধৈর্য হারাচ্ছে বুঝেও লিখে গেছি। আমার তো ধৈর্য হারায়নি লিখতে, বেশ পরম্পরা ধরে গড়ে তুলেছি স্বাচ্ছন্দ্যহীন গল্পবাড়ি।

‘মতামানুষ কথা’ ভাল লেগেছিল সুরজিৎ ঘোষ-এর। কোনো এক পুজো সংখ্যায় ছাপিয়েছিল ‘প্রমা’য়। কথা ছিল শেষ প্রুফ দেখে দেব আমি। দিয়েছিলাম, পাণ্ডুলিপি না দেখেই ঝরঝরিয়ে কাটা প্রুফ শুদ্ধ হয়েছে কী না দেখলাম। এবং সুরজিৎ আমায় মহালয়ার রাতে অশ্রাব্য গালিগালাজ করল, আমার গল্পের যে একটা পাতা ছাড়াই কম্পোজ হয়ে গেছে। লেখকের খেয়াল না করাটা অপরাধ। সে না হয় হল, গালি খেয়েও আমি হেসেছি, যাক আমার গল্পের তা হলে একজন পাঠক তো বাড়ল। ‘মতামানুষ কথা’ গল্পটি সুরজিৎ কয়েকবার পড়েছে, এত ভাল লেগেছে। আসলে আসাম, কলকাতার পটভূমিকায় লেখা গল্পটার কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্যাম সাহেবের সঙ্গে সুরজিৎ মিলে গেছে হুবহু। না, আমি জেনে লিখিনি কিছু। অসমীয়া ভাষায় ‘মতা’ মানে পুরুষ, সেই ‘মতা’ নিতে ‘মতামানুষ কথা’। এখনও দেখা হলেই বলে (আর দেখা হয় না, দেখা হওয়ার বাইরে চলে গেছে সুরজিৎ) ‘কী যেন বিহুগান, রণবীর?’ বলে নিজেই গাইত বিহুর সুরে ‘মুগার হাজে কপো পাহে তোকে ধুনিয়া লাগে’। মানুষটা দারুণ রোমান্টিক ছিল, বড় ঘনিষ্ঠ হয়ে মিশেছে, আমার শ্যাম সাহেবও ছিল তেমন। ওর এক ব্যক্তিগত নারীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ায় কফি হাউসে গুঞ্জন হয়েছিল। এমন কী আমার ব্যক্তিগত জীবনেও। নিজের রোগ অসুখকেও রোমান্টিকতায় মুড়ে দিত। কত রকম রোগ অসুখের নাম বলত, বিদেশে ডাক্তার দেখাতে যেত প্রায়ই। এখন মনে হয়, এরকম হয়, হয়ে যায়। কষ্টকল্পনায় হয়তো শ্যাম সাহেব চরিত্রে সচেতনভাবে কোথাও সুরজিৎ-এর আদল ছিল। সুরজিৎ মেয়েকে ভালবাসত প্রাণপ্রিয়। সব ছেড়েছুড়ে চলে গেল।

‘ত্র্যহস্পর্শ’ আমার ব্যক্তিগত সংকটের গল্প। নিজের কথা ছাড়া কে কখন অন্যের কথা লিখেছে? রাজার শরীরে ঢুকলেও আমি, পথশিশুর শরীরে ঢুকলেও আমার শৈশব। লেখকের আড়াল বড় মজার। লেখালেখি করে, আর নিজেকে সাজায় পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে। গগনচুম্বী ফ্ল্যাটবাড়ির কথা। গায়ে গায়ে থেকেও গায়ে লাগে না। লাগলে ঝনঝনানি। আকাশহীন, সবুজ শূন্য কৃত্রিমতার ভিতর সংসার। লড়াই লড়াই লড়াই করে প্রতিবেশির জানালার কাঁচ ভাঙে। কাঁচের শব্দ যায় পাটি অফিসে। লাল পাটি, গেরুয়া পাটি, হতফুল পাটি। সবাই নিয়ে আসে এক একটি কাঁচের জানালা, বিবাদ বিবাদের জায়গায় থাকুক, বিবাদ না থাকলে পাটি কোন কাজে। কথাকার মানব চক্রবর্তী পড়ে বলেছিল, নতুন ধরণের লেখা। আসলে ভদ্রতার ভাষা। যেখানে শুরু ওখানেই শেষ। তবু মানব আমার প্রিয় লেখক। মানবের লেখা তীব্র অভিজ্ঞতায় জারিত হয়ে বেরোয়। যাপিত জীবন ছাড়া তার বিষয় নেই। অভিজ্ঞতার জন্য আফগানিস্থানের



তালিবান জীবনও যাপন করতে পারে সে ক্লেশকর। কম্পুরুষদের সঙ্গে কাল কাটিয়ে মানব লিখেছেন উপন্যাস ‘সন্তাপ’।

বাবুই পাখির কিছু হারিয়েছে বলে ওঝা ডাকতে হবে কেন? আমার লেখার সূচ আমিই বের করে দেব পাঠককে, উৎসাহিত করব নবীন পাঠককে। না হলেও ক্ষতি কী, একটা নতুন লেখা তো হলো। এবার হয়তো কথা উঠবে, হঠাৎ কেন এত কথা? কেউ কেউ বলেছে, ‘বোকা কাশীরাম কথা’ একটা বই এর নাম হলো? ঠিকই তো, সবাই কেমন স্মার্ট নাম দেয়, বোকামির একশেষ। নাম দেওয়ার দক্ষতাটাও করায়ত্ত হলো না। একটা সঠিক লেখা হলো না। সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। প্রবাহিত হওয়ার নিয়ম শেখা হলো না। কথকতা যার নাম। আবার ভাবি পাগলা ঘোড়াকে বশ করতে পারিনি, ভালই হয়েছে। কৌশল জেনে গেলে কি আর রহস্য থাকত? ঘোড়ায় চড়ার অনুশীলন করে যাচ্ছি বলে খেদ নেই। কথা সমে না পৌঁছুক কিন্তু লয়কারীর বৈচিত্র্য তো আছে। এক গতে দুটো কথা বাঁধিনি কখনও। তাহলে কি আত্মজীবনী হচ্ছে? না, ঢাক পেটানোর শব্দ, শুনুন শুনুন সর্বজন। তা এই হঠাৎ কথারও একটা সূত্র আছে। সেটাই বলি এবার, ‘সাহিত্য’ ৮৪ সংখ্যায় বেরিয়েছে এক প্রবন্ধকের অর্ধেক। নাম, ‘এক ভুবন দুই কথাকার’। কথাকার দুজনের একজন মিথিলেশ, অন্যজন আমি। প্রথম পর্বে মিথিলেশ। দুজনেরই একমাত্র ছাপা বই নিয়ে আলোচনা। তিনজনই প্রিয় বন্ধু। তাই তপোধীর প্রাবন্ধিককে নিরস্ত্র করতে হবে। বরাক উপত্যকার গদ্যসাহিত্য শেখর, মিথিলেশ, রণবীর মিথ প্রতিষ্ঠায় যিনি বদ্ধপরিকর। আমি তো জানি সচিন শেখরকে, জানি সৌরভ মিথিলেশকে, এই দুজনের সঙ্গে আজাহার অরিজিৎ আছেন, আছেন ডালমিয়া শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী, কু-কুড়ির নবীন তারকারাও আছে। আমি সবচে’ বেশি চিনি আমাকে। আমি স্থায়ী কেউ নই। বেড়াতে এসেছি মাত্র। দুটো টেস্ট খেলে কেউ হিরোদের সঙ্গে কভারেজ পায় না। তাই ‘আগামী সংখ্যায় সমাপ্য’ কাশীরামের বোকামি বন্ধ করতে ‘সাহিত্য’ সম্পাদককে গোপন ইমেল পাঠানোর প্রয়াসে এত কথা। যদিও বন্ধ করা যায় নি সেই ঢাকের কথা।

\*\*\*\*\*



# চারটি গল্প ও একটি উপন্যাস

খণ্ড সময়কে ধরিয়া লতার মতো বাড়িয়া ওঠে উপন্যাসের কাল তারপর একসময় সে সময়কে গ্রাস করিয়া ফেলে মহাকাল। সাহিত্যতত্ত্বের ঐরকম একটি সূত্রকথা মনে পড়িয়া গেল ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসের পুনঃপাঠে। সেই সময়ের, শতবর্ষ পূর্বের খণ্ড সময়কে নিয়ে নাড়া চাড়া করিতে গিয়া অনেক কথাই উঠিয়া আসিতেছে প্রস্তুতি পর্বের। তাই বলিয়া নেওয়া ভাল একশত বৎসর পূর্বের সময়টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির অব্যবহিত পরের কথা। ১৯১৩ র মানে ১৩২৯ সালে লিখিতে শুরু করেন চতুরঙ্গ। ‘জ্যাঠামশাই’ ‘শচীশ’ ‘দামিনী’ ও ‘শ্রীবিলাস’ এইরূপ নামে ও ক্রমে প্রকাশিত হয় সবুজ পত্রে ‘সবুজপত্র’র ও পথচলা শুরু প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায়। সেই সময় রবীন্দ্রনাথের ‘বলাকা’ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত ‘ঘরে বাইরে’ লিখিত ও প্রকাশিত হয়ে গেছে সবুজ পত্রের বৈশাখ থেকে ফাল্গুনপর্যন্ত। সেই সুবাদে চতুরঙ্গর পূর্বসূরি ঘরে বাইরে। এইবার বঙ্গ প্রদেশ, ভারতবর্ষ ও বিশ্বের সামাজিক ও রাজনৈতিক সময়েও দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে। বঙ্গভঙ্গ রদ হইলেও মর্লোমিন্টো সংস্কারের মাধ্যমে হিন্দু মুসলমান বিভাজনের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হয়। কলকাতা সহ এশিয়ায় প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তখন সদ্য উত্থান হইয়াছে মোহন দাস গান্ধির। এশিয়ার প্রথম নোবেল জয়ীকে ব্রিটিশ সরকারের নাইট উপাধি প্রদান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইসলামের সাময়িক শক্তিক্ষয়ে ভারতে আবার হিন্দু মুসলমান ঐক্যের পথ খুলিয়া যায়। হিন্দু সমাজেও ভক্তির সঙ্গে শক্তির মিলন হয় এবং সবার উপরে মানুষের সত্য প্রচারের শক্তিশালী সংগঠনের প্রস্তুতিও শুরু হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের মহাসমাধি হয় বিগত শতাব্দীর শেষ পাদে, স্বামী বিবেকানন্দও এক বিশাল কর্মকাণ্ড সমাধা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে। এইসব সময়ের খাপছাড়া কথা না বলিলে কী করিয়া রচিত হইবে কালের পাঁচালী।

১৯০৮ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ রচিত পাঁচখানি উপন্যাসে ব্যক্তিগত হাসিকান্নার কান্নার কথাই বর্ণিত হইয়াছে মূলত। প্রস্তুতি পর্বের শেষ অঙ্গে এপিক উপন্যাস ‘গোরা’ থেকেই এক জাতীয়তাবাদী উপন্যাসকার রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সূচিত হয়। ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসের অন্তরে

যেন ভারত ছাড়া আন্দোলনের দ্বিতীয় চরণ। কুইট ইণ্ডিয়া দেখে যেতে পারেন নি রবীন্দ্রনাথ, স্বাধীন স্বদেশও দেখা হয়নি তার। নাই বা হল, তিনি তার উপন্যাসে বারবার তাঁর স্বপ্নের দেশের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন সুদৃঢ়।

বাংলায় উপন্যাসের ভাষা তৈরি করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ, চলিত ভাষার উপন্যাস রচনা করিয়াছেন ‘ঘরে বাইরে’। পাশাপাশি ‘চতুরঙ্গ’ লিখলেন সাধু ভাষায়। আশ্চর্যের বিষয়, পণ্ডিতেরা বলিয়া না দিলে কাহার সাধ্য ‘চতুরঙ্গ’ ভাষার সাধু নিরূপণ করে। উপন্যাসে আর সাধু ভাষার ব্যবহার করেন নি তিনি। তাই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা যাইতে পারে। শ্রেষ্ঠ শিরোপা যদি ‘চতুরঙ্গ’ কে দেওয়া হয় তাহলে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠিতে পারে ‘গোরা’ নিয়ে ‘চার অধ্যায়’ ‘ঘরে বাইরে’ ‘যোগাযোগ’ ‘শেষের কবিতা’ ই বা কোথায় থাকে। তাই অন্যতম প্রধান বলিলে বোধ করি গোঁসা হওয়ার কারণ দেখি না। একথা তো অনস্বীকার্য যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি রবীন্দ্রনাথের লেখক জীবনের এক বিরাট পঞ্চমুখানি মোড়। অনেক বদ্ধ ঘরের তালা খুলে দেওয়ার চাবি। তিনি নিজেই বলেছে এক স্থানীয় কবি। থেকে হঠাৎ করে বিশ্বপরিচিতির আলোয় চলে আসা কম কথা নয়। এ শুধু এক ব্যক্তি মানুষের কথা নয়, নবীন এক আলোকিত সাহিত্যের ভাষার নবরূপকার হিসেবে যে তিনি সাজিয়ে দিচ্ছিলেন বাংলা বাড়ির ইমারত। বাংলা গদ্য সাহিত্যে পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজও খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক হয়ে ওঠে নি তখনও তার কলমের জাদু স্পর্শে পৃথিবীর সমৃদ্ধ ভাষার তালিকায় উঠিয়া আসিতে বেগ পাইতে হয়নি বাংলার। প্রতিভা কোন প্রতিবন্ধকতায় বাধাপ্রাপ্ত হয় না, কর্ষণযোগ্য ক্ষেত্র ও ছিল না তৎকালীন বাংলায়, পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না লেখা পাঠকের দরবারে পৌঁছাইয়া দেওয়ার। মোক্ষম সময়ে ১৯১৪ য় বাংলা সাহিত্যের বীরবল প্রমথ চৌধুরীর সাময়িকী ‘সবুজপত্র’ র প্রকাশ চলিত বাংলাকে প্রকাশ মাধ্যম করিয়া। রবীন্দ্রনাথও লিখিলেন চলিত বাংলায় ‘ঘরে বাইরে’। কিন্তু ‘চতুরঙ্গ’ কেন লিখিলেন সাধুবাংলায়। ‘চতুরঙ্গ’র চেতনা প্রবাহ ধ্রুপদী বিষয়কে চলিতের লঘুগমন থেকে সাধু ভাষার গাম্ভীর্যে নিয়া গেলেন আবার। রবীন্দ্রনাথ ‘চতুরঙ্গ’ নিয়ে বহুমুখী পরীক্ষার নতুনত্ব প্রদান করিলেন বাংলা ভাষায়। প্রথাগত উপন্যাস লিখন পদ্ধতি থেকে সরাইয়া দিলেন বিষয়ও আঙ্গিক ও অভিমুখ। সমসাময়িক হইল, চারিটি পৃথক অঙ্গে কথা রচনা করিলেন স্বয়ং সম্পূর্ণ ছোটগল্প, আর পরপর জুড়িয়া গিয়া একটি উপন্যাসের রূপ পরিগ্রহ করিল। হয়তো, হয়তো নয়। রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পনা ছাড়া লিখিবেন না এ স্বতঃসিদ্ধ। এরকম গল্প ভাবনায় জুড়িয়া যাওয়া

উপন্যাস লিখিত হয় ন বাংলায়। এই আঙ্গিকের সার্থকতা নিয়াই না হয় আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা যাইতে পারে।

‘জ্যাঠামশাই’ অঙ্গের শুরু এক কথক কথায়, ‘আমি পাড়াগাঁ হইতে কলিকাতায় আসিয়া কলেজে প্রবেশ করিলাম। শচীশ তখন বি এ ক্লাসে পড়িতেছে। আমাদের বয়স প্রায় সমান হইবে।’ পাত্র পরিচিতি প্রায় হইয়া গেল। আমি হইল, শচীশ হইল, শচীশের জ্যাঠামশায় হইলেন নামজাদা নাস্তিক এবং মানবতাবাদী ও যুক্তিবাদী যুগপৎ। নাম জগমোহন। শচীশের বাবা হরিমোহন জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিপরীত রহিয়া গেল দামিনী, ‘জ্যাঠামশায়’ অংশে অনুপস্থিত ‘শচীশ’ অংশে নাম জানা যায়, স্বনাম যেখানে ‘দামিনী’ অংশে প্রস্ফুটিত আর কথক ‘শ্রীবিলাস’ এ উপন্যাস এর নায়ক নিয়ে বিভ্রান্তিতে সমাপ্ত হয় কথা। জ্যাঠামশায় এর কর্ম নিয়া হরিমোহন জগমোহনে তর্কাতর্কি লাগিয়াই থাকে। যেমন,

“তুমি ব্রাহ্ম হইয়াছ?”

ব্রাহ্মরা নিরাকার মানে, তাহাকে চোখে দেখা যায় না। আমরা সজীবকে মানি, তাহাকে চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়, তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না।

তোমার এই চামার মুসলমান দেবতা?”

“রঙ্গ ভঙ্গ যে বাঙালি জীবনকে খণ্ড ছিন্ন করিয়া দিতে পারে তাহারই পূর্বাভাস পাইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই ‘ঘরে বাইরে’ আর ‘চতুরঙ্গ’ তে তার মুসলমান নিয়া ভাবনা। আবার হিন্দু সমাজের জাতিভেদ নিয়েও তিনি কোঠর এবং স্পষ্ট কথকের সঙ্গে শচীশের প্রথম পরিচয় সূত্রে “শচীশ সম্বন্ধে গোড়াতেই আমি দুইটা মন্ত ঘা খাইয়াছি। আমি তাহাকে দেখিয়াই মনে করিয়াছিলাম, যে ব্রাহ্মণের ছেলে। মুখখানি যে দেবমূর্তির মতো সাদা পাথরে কোঁদা। তার উপাধি শুনিয়াছিলাম মল্লিক, আমাদেরও গাঁয়ে মল্লিক উপাধিধারী একঘর কুলীন ব্রাহ্মণ আছে। কিন্তু শুনিয়াছি, শচীশ সোনার বেনে। আমাদের নিষ্ঠাবান কায়স্থের ঘর- জাতি- হিসাবে সোনারবেনেকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করিয়া থাকি। আর, নাস্তিককে নর ঘাতকের চেয়ে, এমনকি, গো-খাদকের চেয়েও পাপিষ্ঠ বলিয়া জানিতাম।” তখনও হয়তো নাস্তিক আর অজ্ঞেয়বাদীর বিতর্ক শুরু হয় নাই। ইহার ভিতর শচীশের বড় ভাই পুরন্দর এর রক্ষিতা ননিবালাকে নিয়া গল্পের সংঘাত ও ক্লাইম্যাক্স। অন্তঃসত্তা ননিবালা জ্যাঠামশায় এর আশ্রয়

নিরাপদ মনে না করায় শচীশ তাকে বিবাহ করিবার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সমাজ সংসার বিরূপ হইলেও জ্যাঠা ভাজিয়ার দৃঢ়তা শিথিল হয় নি। ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ নারীর প্রতি অবিচার করিয়াছেন এই অভিযোগের প্রশ্নচিহ্ন যতই তাকে আঘাত করিয়া থাকুক ‘দামিনী’র সমর্পণ মনোভাব ঘিরিয়া, ননিবালা কিন্তু ইহার মধ্যে ব্যতিক্রম। নারীত্বের পূর্ণ সম্মান নিয়া জ্যাঠামশায় এর ‘শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম’ জানাইয়া আত্মহত্যা করে ‘পাপিষ্ঠা ননিবালা।’ এবং সতের পাতার ছোটগল্প তথা উপন্যাসের প্রথম অংশের সার্থক সমাপন হয়।

দ্বিতীয় অঙ্গ ‘শচীশ’ এর শুরুর বাক্যটি এই প্রকার “নাস্তিক জগমোহন মৃত্যুর পূর্বে ভাইপো শচীশকে বলিলেন, যদি শ্রাদ্ধ করিবার শখ থাকে বাপের করিস, জ্যাঠার নয়। তাঁর মৃত্যুর বিবরণটা এইঃ”

বিবরণে প্রকাশ চামার মুসলমানদের প্লেগ রোগের হাত থেকে বাঁচাইতে নিজের বাড়িতে হাসপাতাল খুলিয়াছিলেন। প্রথম রোগী একজন মুসলমান, সে মরিল দ্বিতীয় রোগী জগমোহন। তিনিও মরিলেন। জ্যাঠামশায় এর মৃত্যুতে শোকে মূহ্যমান শচীশ দুই বৎসর দেশে বিদেশে ফিরিল। একা কথক শ্রীবিলাস নাস্তিকতার কাজ চালাইতে ছিল। কিন্তু শচীশ ছাড়া কী হয়, মহেশ্বর ছাড়া যজ্ঞ হয় না। কথক লিখিল “শচীশ ছিল আমাদের ফুল, সে যখন সরিয়া দাঁড়াইল তখন নিতান্ত কেবল আমাদের কাঁটাগুলো উগ্র এবং উলঙ্গ হইয়া উঠিল।” “এমন সময় শোনা গেল চাটাগাঁয়ের কোন এক জায়গায় শচীশ-আমাদের শচীশ-লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গে কীর্তনে মাতিয়া করতাল বাজাইয়া পাড়া অস্থির করিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে।” তারপর “আমাদের মতো এত বড়ো দুটো দুর্ধর্ষ ইংরেজিওয়ালা নাস্তিককে দলে জুটাইয়া লীলানন্দ স্বামীর নাম চারিদিকে রটিয়া গেল।” কলকাতায় এক প্রয়াত শিষ্য শিবতোষের বাড়ি অধিগ্রহণ করিলেন স্বামীজি। শিবতোষের স্ত্রী দামিনী এইসব মানিয়া লয় নাই। কথক এখানে ছোটগল্পে এক অনন্য আগ্রিকের আশ্রয়ে শচীশের জীবনের দুই নারীর মনোভূমির বর্ণনা দিলেন ডায়ারির ভাষায়। শচীশের ডায়ারি থেকে উদ্ধৃত, “ননিবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি- অপবিত্রের কলঙ্ক যে নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছে, পাপিষ্ঠের জন্য যে নারী জীবন দিয়া ফেলিল, যে মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিল। দামিনীর মধ্যে নারীর আর-এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি, যে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবনরসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলই ভরপুর হইয়া উঠিতেছে, সে কিছু ফেলিতে চায় না, সে সন্ন্যাসীকে

ঘরে স্থান দিতে নারাজ, সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি-পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে।”

ভক্তির বন্যায় ভাসিয়া গেল দুই নাস্তিক। শচীশ আর রাঁয়চাদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি প্রাপ্তের নিবৃত্তি মার্গে গমন। ভক্তি ভ্রমণে সমুদ্র মধ্যে এক অন্তরীপে গিয়া পৌছায় তাহারা। পাহাড়ের গায়ে অনেক কালের খোদিত এক গুহা। সে কি চাঁটগা না ওয়ালটেয়ারের বঙ্গোপসাগর। সেই গুহাতে দামিনী সহরাত কাটানোর সিদ্ধান্ত হয়। লীলানন্দ স্বামীর কণ্ঠে আধুনিক এক গান শুনে দামিনীর ভাবাশ্রয় হয়। শেষের কলি,

“ক্ষণেক তুমি দাঁড়াও-তোমার

চরণ ঢাকি এলো কেশে”

গান শুনে “দামিনী মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল- অনেকক্ষণ মাথা তুলিল না, তার চুল এলাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।” সে প্রণাম কাহাকে করিল, সে কি শচীশকে। দামিনীতো লীলানন্দ স্বামীকে অবজ্ঞা করে। শচীশের ডায়ারিতেও সে রাতের কত কথা, বিভ্রমে ছন্নমতি শচীশের লেখায় ‘কম্বলের রোঁয়া’ ‘বুনোজন্তুর রোঁয়া’ ‘সাপের মতো জন্তু’। পুরুষ শচীশ লাঠি মারিয়া সরাইয়া দেয়। এখানে নারীত্বের অপমান যদি পণ্ডিতেরা দেখিয়া থাকেন, ভুল দেখেন নাই। শচীশের ডায়ারির শেষ লাইনটি পড়িলে আর মানের কথা মনেও থাকে না, “অন্ধকারে কে চলিয়া গেল। একটা কী যেন শব্দ শুনিলাম। সে কি চাঁপা কান্না?” এই অঙ্গও সার্থক হইল ছোটগল্প রচনায়। অপরূপ সমাপন।

এবার ছোটগল্পের বাঁধন সরিয়ে দুই নদী যেন সাগরে পড়িল। দামিনী অঙ্গে এসেই যেন চেতনা প্রবাহের মূল ধারায় মিশিয়া গেল উপন্যাস। দামিনী আর শচীশের মনোজগতের টানাপোড়েন উপন্যাসে উপেক্ষিত বিশ্রী কথকের অপেক্ষারত মনোবাসনা, দামিনী লীলানন্দ স্বামীর সংলাপের তির্যকতার উত্তরে শচীশকে ‘গুরু’ত্বে বরণ এতসব বৈপরীত্যের ভিতর গল্পকথার রসায়নের আধার হয়ে ওঠে মূল অংশটি। ছোটগল্প উপন্যাসে মিলিত হইয়াও স্বধর্মচ্যুত হইল হইল না অঙ্গের শেষ অনুচ্ছেদটি কথক বলিলেন, “দামিনী শচীশের পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল। গুনগুন করিয়া বলিতে লাগিল, তুমি আমার গুরু, তুমি আমার গুরু! আমার সকল অপরাধ হইতে বাঁচাও, বাঁচাও বাঁচাও।”

ষোল পাতার দামিনীতে একটি পরিশিষ্টও আছে, পরিশিষ্টে একটি কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ, পাঠককে, পরবর্তী অঙ্গে পৌঁছাইয়া দিবার অভিলাষে লিখিত, “আমার সঙ্গে দামিনীর বিবাহ হইয়াছে- এই বিবাহের রহস্য কী তা সকলে বুঝিবে না, বোঝার প্রয়োজনও নাই।”

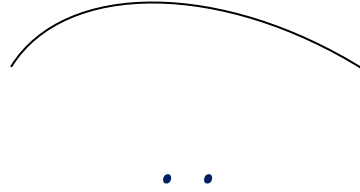
শেষাংশই সর্ববৃহৎ ১৮ পাতার। অঙ্গ নাম শ্রীবিলাস। শুরুতেই শেষের কথা, “এখানে একসময় নীলকুঠি ছিল। তার সমস্ত ভাঙিয়া চুরিয়া গেছে, কেবল গুটিকতক ঘরবাকি। দামিনীর মৃতদেহ দাহ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় এই জায়গাটা আমার পছন্দ হইল, তাই কিছুদিনের জন্য এখানে রহিয়া গেলাম।” শচীশ চলিয়া যাওয়ার পর দামিনী শান্ত হইয়া যায়, কিন্তু কোন আত্মীয় বাড়িতে তার ঠাই হয় না। কথক শ্রীবিলাস তাকে বিবাহ করে নেয়। শচীশের বাড়িতেই তাহারা ফিরিয়া আসে, দামিনীর বৃন্দাবনে যে। কথক গৃহস্থ হয়, স্বামী স্ত্রী দুইজনে মিলিয়া ঘরকন্না সমাধা করে, সামাজিক দায়ভারও কাঁধে তুলিয়া লয়। “ঘরের কাজ সারিয়া দামিনী পাড়ার ছোটছোট মুসলমান মেয়েদের সেলাই শিখাইতে লাগিল।” গুহা হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে দামিনীর বুকের মধ্যে একটা ব্যথা হইয়াছিল। সেই ব্যথার দায়ে শ্রীবিলাসের সঞ্চয় নিঃশেষ হইল। হাওয়া বদলের জন্য হাওয়া ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। দামিনী তাও বলিল, “যেখান হইতে ব্যথা আনিয়াছি আমাকে সেই সমুদ্রের ধারে লইয়া যাও- সেখানে হাওয়ার অভাব নাই।”

ছোটগল্পের সমাপ্তিতে অকথিত সব রহস্যই ঢালিয়া দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু উপন্যাসের সমাপন যে বাকি রহিল। কথক কেও যেন কোথাও জড়িয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ শেষ অনুচ্ছেদ এর শেষ সংলাপে, “সেদিন দামিনী আমার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।”

গ্রন্থপাঠও হইয়া গেল। অভিনব বটে, ছোটগল্পের মুন্সিয়ানা আর হয়ে ওঠার উপন্যাস। একই কথকে বয়ানে বিভিন্ন চরিত্রের রূপায়ন বাংলা সাহিত্যের এক নবীন প্রবর্তন। কথকস্বরের সহায়ক ডায়ারির ব্যবহারে লেখক গল্পের দ্রুত গমন মস্তুর করেন নি। দেশি বিদেশি ভাণ্ডার উপুড় করা বয়নের সাধু ভঙ্গি ও উপন্যাসে চরিত্র হইয়া উঠিতে অন্তরায় হয় নি। বিতর্কিত কিছু বিষয় হয়তো রহিয়া গেল, যেমন নারীবাদী সওয়াল জবাব, ইউরোপীয় ধারার চেতনা প্রবাহ মাধ্যম কী উপন্যাসে বর্তমান, সামাজিক ও ধর্মীয় বিবাদ সামাধান না পাত্রপাত্রীর মনোলোকের অন্তর্দৃষ্টিকোনটি প্রধান নাকি এও উপন্যাসের অন্তর্ভবন, কিংবা হিন্দু



ভক্তিমাৰ্গ আৰু নাস্তিকতাৰ অসম লড়াই, এৰ বিশ্লেষণী নিৰ্যাস হয়তো ৰহিয়া গেল অবিতৰ্কিত,  
কাৰণ ৰবীন্দ্ৰনাথকে বিচাৰুৱাৰ অধিকাৰ এখনও অৰ্জন কৰেনি মুক্ত বাঙালি। তবু খেদ  
থাকিয়া গেল নিৰ্ভুল আগিকেৰ চতুৰঙ্গ নিয়ে যেন আৰো অনেক কথা বলিবাৰ ছিল।



# বর্ষা

ধূমজ্যোতি সলিল মরুতাং সন্নিপাতক্ মেঘঃ।

বাতাস জল ধোঁয়া এবং আলোকের কোথায় মেঘরূপী সমবায়।

এই তো মেঘ। মেঘে জল। জলে বর্ষা। বর্ষার লজল রূপ।

কালিদাসের বর্ণনা আর বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ। এরচেয়ে মোক্ষম যুগলবন্ধী আর কী হতে পারে। তবে প্রশ্ন জাগে একি শুধু বর্ণনা না মেঘ বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা যার সজলঘন বরিষনে বাঙালি জীবনে, বাঙালি প্রণালীই স্তব্ধ হয়ে যাকে যতক্ষণ না বর্ষা সমাগমে নদীনালা ভরে ওঠে, বাঙালির মন সজল হয় না। বাঙালি জীবনে চার ঋতু না ছয় হোক বর্ষার মতো মোহিনী মায়া আর কারো নেই। ঋতুবদল মানে তো আকাশের ও সাজবদল, ঋতুরঙ্গ নাট্যশালায় নটরাজের তা তা থৈথৈ। ধারা নৃত্যের অভিনবত্বে তাই বর্ষা, বিশিষ্ট, বর্ষা আছে বলেই পৃথিবী উর্বরা, শস্য শ্যামলা কবি হৃদয় উতলা। এই বর্ষার রূপ দেখেই বাংলার এই আদি কবি রচনা করেছিলেন প্রথম শ্লোক---

মেঘৈর্মে দুরম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্ত মালদ্রুমৈর্নভংভীড় রয়ং ত্বমেব তদিমংরাধে গৃহং প্রপয়।

যে- যাই বলুক, যতই ভগবততত্ত্ব বিশ্লেষণ হোক, 'রাধে গৃহং প্রাপয়' বলতে বর্ষা সন্ধ্যায়, দায়িত। সম্ভাষনের এমন মোক্ষম প্রয়োগ বাঙলায়ই সম্ভব।

আবার ফেরা যাক বাস্তবের ভূমিতে। 'কেন' প্রশ্নের উত্তরে কেন এমন প্রিয় বর্ষাঋতু বঙ্গজীবনে। প্রথম ঋতুর তীব্র দাবদাহে রুগ্ন নটরাজের প্রলয় থামাতে ধারা বর্ষনের বিকল্প নেই। উষ্ণায়নের গ্রীন হাউস প্রভাব থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়ে জল ঢেলে দেওয়া। বর্ষার আগমনে অনেকটাই নির্জীব হয়ে যায় দূষিত গ্যাস। তাই বর্ষার জন্য হাপিত্যোস, কোথায় পাব তারে। কবে কোন শৈশবে শেখানো হয়েছিল, জুন মাসের ছয় থেকে সাত তারিখের মধ্যে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব বর্ষাদেবীর আগমনে হবে শ্যাম বঙ্গদেশে। কিন্তু কোথায় কী কত সাধাসাধি, তেল সিন্দুর দিয়ে ব্যাঙের বিয়ে দেওয়া হয়। গান গাওয়া হয়, মাটি ফাটা রোদুরে,

আল্লা মেঘ দে পানি দে। তারপর আবহাওয়া দফতর থেকে আকাশবাণী শোনানো হয় দূরদর্শনে, ওড়িশা উপকূলের ঘূর্ণবর্ত মৌসুমি বায়ুকে ধাক্কা মেরে দক্ষিণ বঙ্গে ঢুকিয়ে দেওয়ায় অনেক যদি পূর্ণ হলে ধারা বরিষণ।

তাও যদি শোনেন বরুণদেব। সময়ের সাধাসাধি বিফল গেলে বাঙালি বলে কুছ পরোয়া নেই। চলো যাই মেঘের দেশে। ভ্রমন বিলাসী বাঙালি মেঘালয়ের আনবাড়ি গিয়ে দেখে মেঘের খেলা। মেঘ বৃষ্টির দেশ চেরাপুঞ্জির যত্রতত্র যখন তখন দেখা পাওয়া যায় মেঘের। বাঙালি কবি যেমন লিখিছিলেন। 'এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে'। অন্য এক বাঙালি কবি ও কালিদাসের মতো কাণ্ড করে বসলেন চেরাপুঞ্জির মেঘ বাংলায় না পাঠিয়ে বলে দিলেন ভিন্ন কথা ---

'চেরাপুঞ্জির থেকে

একমাস মেঘ ধার দিতে পার গোবিসাহারার বুকো।'

(২)

বর্ষার মেঘবর্ণনায় চেরাপুঞ্জির সঙ্গে আলী সাহেবের কথাও এসে যায় প্রাসঙ্গিক। চেরাপুঞ্জিতে মেঘের ওড়াওড়ি দেখে তার নিজস্ব উপভাষা সিলেটি এক ছড়ায় মেঘ বর্ণনা করেছিলেন, ---

'পিঞ্জা মেঘের আঞ্জাআঞ্জি

চেরা পুঞ্জির পাড়ো।

ধলা ভেড়া ফাল দি পড়ে

কাল ভেড়ার ঘাড়ো।'

এমন লৌকিক বর্ণনা আর হয় না। একটু সুত্র ধরিয়ে দেওয়া যায় উপভাষায় মান্য রূপে 'পেঁজা মেঘের ওড়াওড়ি চেরাপুঞ্জির পাহাড়ে। যেন সাদা ভেড়া লাফিয়ে পড়েছে কালোর ভেড়ার ঘাড়ো। কী দারুণ না। বর্ষার রূপকথায় তার কথা না বলে কী পার পাওয়া যায়। বাঙালি সে তার বকলমেই বর্ষা উপভোগ করে যাচ্ছে দেড়শ বছর ধরে, অনূ্যন একশ এগারটি বর্ষার

গান লিখেছেন যে মহামহিম। বর্ষামঙ্গল আর মেঘদূত নামের কবিতা থেকে আবৃত্তি করে বাঙালি মুগ্ধ করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। মেঘলা বিকেলে বাঙালি সুরে বেসুরে এখনও গায় চিরচেনা চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় কণ্ঠের 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা।' কিংবা এমন পদকথার বিরহ 'এভরা বাদর মাহ ভাদর/শূণ্য মন্দির মোর।' কিংবা অতুল প্রসাদের 'বঁধুয়া নিদ নাহি আখি পাতে।' ডাকিছে দাদুরি মিলন পিয়াসি গাইতে গাইতে অবাক হয়ে দাদুরি শব্দের দাদুরিকেও খুব পাওয়া হয়ে যায় বাঙালির। বর্ষার অনুষঙ্গে সেই উর্দু শায়রি তো সব বিরহীরই জানা। 'হে বর্ষা এতবেশি ঝরো না যে আমার প্রেয়সী আমার কাছে আসতে না পারে। ও এসে যাওয়ার পর এমন মুষলধারায় ঝরো যেন ও যেতে না পারে।'

বর্ষার সঙ্গে লৌকিক অনুসঙ্গ যত নিবিড় তার রেশ পাওয়া যায় শ্রাবন শেষে মনসা পূজার বৈচিত্র। বরাক উপত্যকার কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর কবিতা পাঠ ও বর্ষার এক অনুপম উপভোগ। ---

'সগুণ্ডিঙা মধুকর চারি দিকে জল

শ্রাবণের অবিশ্রাম মনসামঙ্গল।

পচাপাটে এঁদো ডোবা বিষধর ফনা

ছেঁড়া কাথা-কানি আর বেহুলা যন্ত্রনা

হু হু করা কালোসন্ধ্যা ভেসে আসা গানে।

সায়েব ঝিয়ারি যায় অনন্ত ভাসানে।'

বর্ষার অলস অবাধ সময়ের শ্রেষ্ঠতম পুরস্কারই হল পড়াশুনা। বর্ষার কবিতা পার কিংবা বর্ষার গান শোনা। কুঁড়ের বাদশা বাঙালির শুধু অজুহাত চাই। চাই একটু পিটির পিটির ইলশে গুঁড়ি। খিচুড়ি ইলিশ ভাজা যদি একটু মহার্ঘ হয় বঙ্গজীবনে। নিদেন পক্ষের দ্বিজন এর চেয়ের দোকানে পেঁয়াজি ফুলুরির কড়াটা তো বসিয়ে দিতে পারে আড্ডাজনদের মুখরঞ্জে।

\*\*\*\*\*

# ফেসবুক এর বান্ধবসভায় দুর্গেশনন্দিনী

বাঙালির প্রথম উপন্যাস রচিত হয়েছিল দেড়শ বছর আগে, ১৮৬৫তে। এখনও পণ্ডিতকূলে এ নিয়ে মতভেদ, তাদের সমস্যা তারাই নিরসন করুন। বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েই বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের সূচনাকাল ধরেই পাঠ শুরু করা যাক। চট্টোপাধ্যায় লেখক তখন বয়সে নবীন, আর যুবা লেখকের কাছে যে নিটোল প্রেমোপাখ্যানের বিকল্পও কিছু থাকে না। প্রেমের উপাখ্যানে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক এবং সমাজনৈতিক বিভাজন থাকতেই পারে। সাধারণ পাঠক নিজের মতো বিচার করবে। রচনায় ইতিহাসের ছোঁয়া থাকলে পাঠের আনন্দ দ্বিগুণিত হয়, আখ্যানের স্থানে ইতিহাস উঁকি দেয় কিংবা বর্ণনার গুণে ভূগোল ভেসে ওঠে বিবরণে। যেমন প্রথম ক্ষেত্রে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর সংলগ্ন গড় মন্দারণ, দ্বিতীয়ে বাংলা ওড়িসার উপকূলে কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের বিখ্যাত মন্দির। তো যে উপন্যাসটির পুনঃপাঠ এবং প্রতিক্রিয়ার উদ্যোগ, পঁচিশ বছরের টগবগে যৌবনকালে ইতিহাসকে সাক্ষী রেখে তা রচনা করেন সাহিত্যসম্রাট। বঙ্কিমচন্দ্রকে কেউ কেউ বলেন বাংলার স্কট, কেন বলা হয় না বুঝলেও পড়াটা হয়ে যায়। অভিধার সপক্ষে যুক্তি খুঁজতে স্যার ওয়াল্টার স্কটও পড়া হয়ে যায়। ইতিহাস কথায় প্রতিপক্ষের উদারতা, চক্রান্ত এসব তো থাকেই। ধর্মযুদ্ধ ফেরৎ স্যাক্সন বাজা রিচার্ড অস্ট্রিয়ায় বন্দী হলেন। আর এক স্যাক্সন রাজপুরুষ আইভানহো র কাণ্ডকারখানা প্রেম পরিণয় এই নিয়ে উপন্যাস। ওখানেও আছে এক দুর্গেশনন্দিনী রোয়েনা আর আয়েষার আদলে রেবেকা। এই মাত্র মিল ছেচল্লিশ বছর আগের লেখা আর বঙ্কিমের উপন্যাসে। সৎভাই এর চক্রান্ত আর ভ্রাতৃঘাতী সন্ত্রাসে নর্মান আক্রমণে স্যাক্সন নির্মূল হচ্ছে, এইতো ইতিহাসের উপাদান। এই সময়ের মিলও পাওয়া যায় যখন একদেশ বলে হিন্দুশূন্য করবে অন্যদেশ বলে মুসলমানশূন্য করবে। ইতিহাস কথা তো দাঙ্গা চক্রান্ত যুদ্ধ আর রাজকাহিনি নিয়ে হয়। তাহলে কি উত্তরকালের যে কোন লেখকের রচনাই পূর্বপুরুষের লেখার ছায়ামাত্র। এত সহজ সরল নয় সিদ্ধান্ত। আর বঙ্কিমের নায়ক মোগল সেনাপতি মানসিংহপুত্র জগৎসিংহ, একা জগৎসিংহ তো নন, প্রতিনায়ক ওসমানও কম কিসে, নায়কের সম্মানে

সম্মানিত। আইভানহো আর ছদ্মবেশী ব্ল্যাকনাইট কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী নন সে অর্থে। তিলোত্তমার মতো বিভ্রাময়ী রূপ বর্ণনা কোথায় রোয়েনার। উপেক্ষিত সহনায়িকা আয়েষার এমন প্রেমোদ্দীপ্ত সংলাপ “শুন ওসমান, আবার বলি, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর...” আজও বাঙালির হৃদয়ের সম্পদ হয়ে আছে একশ একান্ন বছর ধরে। আর তিলোত্তমার রূপ কথা, থাক সে না হয় হবে বারান্তরে।

আপাতত এক অভিনব পন্থায় দেড়শ বছরের ওপারে যাওয়ায় প্রকল্পে সামিল হওয়া যাক। ব্যক্তিগত সংকটমুক্তির উপায়। প্রায় মাস দুয়েক আগে বাড়ির বাইরে থাকব, ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, সহায়ক বইপত্র ছাড়া লিখব কী করে। তাই ভারুয়াল বান্ধবসভা ফেসবুকে এক অধিবেশনএর ডাক দিয়ে বেরোই বাড়ি থেকে, উন্মুক্ত ভাষার অভ্র বর্ণমালায় লিখি,

“৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অন্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।”

উর্দ্ধকমার মাঝখানে ঐ পর্যন্ত লিখে নিজের মন্তব্য দিই নীচে,

“১৮৮৫ তে প্রকাশিত উপন্যাসের প্রথম পঙক্তি। দেড়শ বছর অতিক্রান্ত।”

লিখলাম ফেসবুকে মনে হল ওএলএক্স এ বিজ্ঞাপন দিলাম দেড়শ বছরের পুরনো জিনিষ বিক্রি করতে।

হায়রে বান্ধব সমিতি, ৫ জুলাই ২০১৬র পোস্ট এ এখন পর্যন্ত ৩৫ জনের পছন্দ জমা পড়েছে আর জনা আটকের মন্তব্য দু এক লাইনে। একজন মাত্র ব্যতিক্রম, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রক্তদান আন্দোলনের পুরোধা আশু পালের দীর্ঘ মন্তব্যটুকু দিয়েই মঙ্গলাচরণ করা যায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের পুনঃপাঠ প্রতিক্রিয়ার,

“ ২০১৩ সাল, জানুয়ারি মাস যাই যাই করছে। আমরা বিবেক র্যালির সদস্য হয়ে গেছি কামারপুকুর। একদিনের যাত্রা বিরতি আছে। সুযোগটা কাজে লাগলাম। আমার অশ্ব নেই তো কি হয়েছে, বাইক তো আছে ! গেলাম জয়রামবাটি। একজন মাঝ বয়সী দোকানীর কাছে জেনে নিলাম গড় মান্দারণে যাওয়ার পথ। জেনে নিলাম সেখান থেকে বিষ্ণুপুরের দূরত্বও। আমার ভিতরের পাগলটা লাফিয়ে উঠে তাগাদা দিতে লাগলো, চল, চল, চল। আমার পাগলামীতে কেউ সঙ্গী হতে চাইল না। ... তবে একলা চল রে। দিগন্ত বিস্তৃত আলু আর রাঙা আলু ক্ষেতের মধ্য দিয়ে লাল কাঁকড়ের মেঠো পথ চলে গেছে ঐক্যেবঁকে। কামারপুকুর থেকে মাইল ছয়েক দক্ষিণে বড় বড় ঝাঁকড়া গাছের জঙ্গলে ঢাকা পড়ে আছে গড় মান্দারণ। প্রথমে গেলাম



সেখানে। ঘণ্টা খানেক ইতিউতি ঘুরে বেড়ালাম। না আমি ছাড়া আর কোন পর্যটক নেই সেখানে। ইতিহাসের এই পাতা এখন বিস্মৃত, ধুলিময়। এবার জিজ্ঞেস করে করে সংক্ষিপ্ত গ্রাম্য রাস্তা ধরে এগোলাম বিষ্ণুপুরের পথে। ক্রমেই আরও উত্তর পশ্চিমে যাচ্ছি। পেরিয়ে যাচ্ছি একের পর এক গ্রাম। চোখের সামনে ফুটে উঠছে গ্রাম বাংলার অপূর্ব মায়াময় দৃশ্য। যাচ্ছি আর ভাবছি, এই পথেই কি? এই পথেই কি এসেছিলেন ওই অশ্বারোহী? তখন নিশ্চয় এই গ্রামগুলির অস্তিত্ব ছিলনা। ধূ ধূ প্রান্তরই ছিল নিশ্চয় ? প্রায় ৪৫ কিলোমিটার পর পেয়ে গেলাম বিষ্ণুপুর। আহ্ ...। কিছুক্ষণ কাটিয়ে ফিরে এলাম বড় রাস্তা ধরে। এবার পথ দীর্ঘ হলেও সময় সংক্ষিপ্ত হল। বন্ধুরা শুনে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করল। ওরা কি জানে, আমি ইতিহাসের আর বন্ধিম উপন্যাসের কোন অধ্যায় ঘুরে এলাম।”

অপূর্ব বর্ণনা। এই সময়ে বন্ধিম হলে ভাষা এমনই বর্ণময় হয়ে উঠত।

অনির্বাক বসু কলকাতার যুবা লেখক বিস্ময়ে জানাল উপন্যাসের নাম।

সৌমিত্র কিন্তু তার প্রিয় বিষয় সিনেমার সংলাপে জানালেন, “চারুলতার সেই গুনগুন মনে পড়ে গেল, ‘বন্ধিম বন্ধিম’।”

মৃন্ময় চক্রবর্তী বললেন বাঙালির শ্রেষ্ঠ প্রতিভা।

ভার্চুয়াল দুনিয়ার আলোচনা সভা তো এভাবেই হয়।

মাঝখানে আমার কথক কণ্ঠ আবার প্রকট হয় বন্ধিমকথায়,

“আমাদিগের আত্মপরিচয় আপনারা দিবার রীতি নাই”

বন্ধিমকে কেন যে পরধর্ম বিদেষী বলা হয় বুঝি না। আয়েষার মতো একজন উপেক্ষিত প্রেমিকা কজন আছে বাংলা সাহিত্যে। ওসমানের মতো শত্রু হয়েও মিত্রের অধিক চরিত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ধর্ম কখনও ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রতিবন্ধক হয় নি।

চয়ন গুপ্তও সমর্থন করলেন সাহিত্য পাঠের ফিরে পড়া, বারবার পড়ার রীতি। প্রশান্ত বিকাশ রায়ও মান্দারণ স্মৃতির পুলক জাগালেন।

উৎসাহিত হয়ে আবার দিই উদ্ধৃতি,

“শৈলেশ্বর!তোমার মন্দিরমধ্যে যে সুন্দরীর সরল দৃষ্টিতে এই যোদ্ধাপরাভূত হইয়াছিলেন,সে সুন্দরীকে সেনা-কোলাহল মধ্যে কি তাঁহার একবারও মনে পড়ে নাই? যদি না পড়িয়া থাকে,তবে জগৎসিংহ তোমারই ন্যায় পাষণ।”

এতো গেল বীরেন্দ্রসিংহ তনয়া তিলোত্তমার স্বগতোক্তি। এবার পাঠান সেনাপতি কতলু খাঁর কন্যার স্বগত সংলাপটিও লিখে দিলেন নবীন কথাকার মেঘমালা দে,

“আয়েষা বাতায়নে বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। অঙ্গুলি হইতে একটি অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিলেন। সে অঙ্গুরীয় গরলাধার। একবার মনে মনে করিতেছিলেন, “এই রস পান করিয়া এখনই সকল তৃষা নিবারণ করিতে পারি।” আবার ভাবিতেছিলেন, “এই কাজের জন্য কি বিধাতা আমাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন? যদি এ যন্ত্রণা সহিতে না পারিলাম, তবে নারী-জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম কেন? জগৎসিংহ শুনিয়াই বা কি বলিবেন?”

গরলাধার অঙ্গুরীয় নিয়ে হয়তো একটু ধন্দ ছিল। মেঘমালা দে’র সময়োচিত সংযোজন তার নিবিষ্ট পাঠ কেই প্রশংসিত করে।

এরপরই কথোপকথনে মোক্ষম মোচড় রূপরাজ ভট্টাচার্যর রসসিক্ত ভাষ্যে,

“দুর্গপরিখার জলে আয়েষা নিষ্কিণ্ত সেই গরলধার অঙ্গুরীয়খানিই বুঝি পরবর্তীকালে জলকে বিষাক্ত করে এবং তা সিঞ্চিত হয় বিষবৃক্ষের বীজতলীতে?”

এক থেকে অন্য পাঠের উৎসাহ উসকে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ অধ্যাপক মহাশয়কে।

ফেসবুকে নবীন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে অসফল হইলেও, মাঠে মারা যায় নাই। অন্তত কয়েকজন তো তাদের এককথায় দুকথায় বহুকথায় উপন্যাস পাঠের ভিন্ন দৃষ্টিকোণ উন্মোচিত করেছেন।

আমাদের বয়সীদের বঙ্কিম পাঠের শুরু তেরো বছর বয়স থেকে। ‘আনন্দমঠ’ এর প্রথম পরিচ্ছেদ ‘ছিয়াত্তরের মন্ডন্তর’ নামে নবম শ্রেণির পাঠ্য ছিল। শুরুতেই ভাষার চমক,

“১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময়, লোক দেখি না।”

গ্রামের নামও যে পদচিহ্ন হতে পারে ভাবা যায় না। ভাবি,এ লেখা সাহিত্যের কোন রাজা মহারাজার না হয়ে যায় না। দ্বিতীয় বাক্যপাঠে মনে হয় তিনি রাজাধিরাজ, সম্রাট বটে। অনুচ্ছেদের শেষ অংশে কিছু বুঝা যায় কিছু না, কিন্তু বালক পড়ে যায় বারবার,

“তাহার অভ্যন্তরে ঘরের ভিতর মধ্যাহ্নে অন্ধকারে নিশীথফুল্লকুসুমযুগলবৎ এক দম্পতি বসিয়া ভাবিতেছে। তাহাদের সম্মুখে মন্ডন্তর।”

বর্ণনার আঁতিপাঁতি খুঁজতে গেলে বঙ্কিম পড়তেই হবে। আর ‘নিশীথফুল্লকুসুমযুগলবৎ’ শব্দের অর্থ তখন না বুঝলেও মুগ্ধ করেছি আনন্দে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পরিক্রমায় আনন্দমঠ যদি হয় সমাপন বিন্দু তাহলে তো কথা রাখতে আবার ফিরে যেতে হবে শুরুতে। তিলোত্তমা বর্ণনা না পড়লে যুবামন কী করে আকৃষ্ট হবে পঁচিশবছরে যুবক বঙ্কিমের শতক হাঁকানো প্রথম আখ্যানের প্রতি,

‘সুগঠিত সুগোল ললাট, অপ্রশস্ত নহে, অথচ অতিপ্রশস্তও নহে, নিশীথ কৌমুদীদীপ্ত নদীর ন্যায় প্রশান্ত ভাব-প্রকাশক, তৎপার্শ্বে অতিনিবিড়-বর্ণ কুণ্ডিতালক কেশসকল ভ্রুযুগে, কপোলে, গণ্ডে, অংসে, উরসে, আসিয়া পড়িয়াছে; মস্তকের পশ্চাত্তাগের অন্ধকারময় কেশরাশি সুবিন্যস্ত মুক্তাহারে গ্রথিত রহিয়াছে; ললাট ভ্রুযুগ সুবন্ধিম, নিবিড় বর্ম, চিত্রকর লিখিতবৎ হইয়াও কিঞ্চিৎ অধিক সুস্মাকার; আর একসূতা স্থূল হইলে নির্দোষ হইত।’

পঞ্চবিংশবর্ষীয় যুবক বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার প্রথম আখ্যানের খসড়া ভাটপাড়ার বৃদ্ধ পণ্ডিতদের পড়ে শুনিয়াছেন, তাদের বলেছেন কিঞ্চিৎ ব্যাকরণদোষে দুষ্ট হতে পারে। পণ্ডিতেরা বলেছেন যেখানে ব্যাকরণদোষ আছে ঐ জায়গাগুলি পাঠসুখে উত্তম রচনা হয়েছে।

অস্যার্থ, বেদ প্রথম, লেখাই প্রথম এবং প্রধান, বেদাঙ্গ সৃষ্টি করে নিবিড় পাঠক। লেখকের সত্যে নিবদ্ধ থাকলেই হবে। নবীন পাঠকের প্রতি আর কী হতে পারে উত্তম সংকেত।

ভার্চুয়াল আর এগোয় নি। যতটুকু হয়েছে মন্দ কী।

এই সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ বন্ধিম চর্চায়, ‘দুর্গেশনন্দিনী’ পাঠের উপক্রমণিকার সমাপন হয় বন্ধু সুব্রত নন্দী মজুমদারের উষ্ণ ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাবে।

\*\*\*\*\*

# ଧନ୍ୟବାଦ



[smazumdar07@gmail.com](mailto:smazumdar07@gmail.com)